সুচীপত্র

মুখবন্ধ

আমি কে ?

কি করতে হবে ?

জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

ঈশ্বর কি আছেন ?

যদি হ্যা হয়, তবে কেন তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ?

কোন ধর্মটি সত্য ?

প্রতিটি শিশু এই প্রশ্নগুলো তাদের মনে জাগ্রত করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদেরকে ধর্মনিন্দার ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া হয়। কারন বেশিরভাগ ধর্মগুলোতেই, প্রশ্ন করা হলো ঈশ্বরকে অপমান করা । রীতিনীতি প্রশ্নগুলোর জায়গা নিয়ে নেয় । ধর্মনিন্দার ভয় সত্যের অনুসন্ধানের জায়গা নিয়ে নেয়।

যখন আপনি ধর্মনিন্দা ও ভয়ের মাঝে থাকেন, হিন্দুধর্ম আসে আপনাকে উদ্ধার করতে। আপনি হয়তো আপনার ধর্মের ঈশ্বরের উপর প্রশ্ন করতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঈশ্বর আপনাকে আমন্ত্রন জানায় তাঁকে প্রশ্ন করতে। তাঁর সাথে কথা বলুন। তাঁকে উপহাস করুন। এবং এমনকি তাঁকে বাতিলও করুন। এখানে কোন ধর্মনিন্দার ভয় নেই। আপনি উত্তর না পেলে তাঁকে বাতিল করুন। যদি আপনি তাঁকে পছন্দ করেন তাঁকে গ্রহন করুন।

অন্য ধর্মগুলোতে, আপনি ঈশ্বরের দাস । হিন্দুধর্মে, আপনি ঈশ্বরের সন্তান । অন্য ধর্মগুলোতে, আপনি নরকের ভয় করেন, এবং ভয় থেকে ভালো কাজ করেন। হিন্দুধর্মে আপনি মাতৃময়ী ঈশ্বরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা থেকে ভালো কাজ করেন । হিন্দুধর্ম হলো সর্বশক্তিমানকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর সাথে কথা বলা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর সাথে হাসা, তাঁকে প্রশ্ন করা, মজা করা এবং তাঁর সাথে হাঁটা। যখন আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, মাতৃময়ী (ঈশ্বর) আপনাকে তাঁর কোলে তুলে নেবেন এবং হাঁটবেন। যখন আপনি আঘাত প্রাপ্ত হন, মা রক্ষা করবেন।

এই বইয়ে ১৭০+ প্রশ্ন আছে যেগুলো প্রতিটি ধর্ম উত্তর দিতে চায় কিন্তু ব্যার্থ হয়। এবং আপনি জানবেন কেন তারা ব্যার্থ হয়। কারন এটি আসলে উত্তর খোঁজার বিষয় না, এটি মায়ের কোল খোঁজার বিষয় যেখানে সব প্রশ্ন উধাও হয়ে যায়.........

সঞ্জিব নেওয়ার

মার্চ ২০১৭, নয়াদিল্লী, ভারত।

{১}

ঈশ্বরের ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি ?

ঈশ্বরের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা হতে পারে। (ঈশ্বর) অসীম এবং শরীরবৃত্তিয় চেতনা জগতের বাইরে হওয়ার কারনে, ঈশ্বর শব্দের অর্থ কয়েকটি শব্দ বা বাক্যে প্রকাশ করাটা কঠিন। তুলনামূলক উপযুক্ত সংজ্ঞাগুলো নিম্মরূপ হতে পারেঃ

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ - অস্তিত্বমান, বুদ্ধিমান ও আনন্দময়।

ঈশ্বর নিরাকার

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

তিনি সর্বজ্ঞ

তিনি ন্যায়কারী

তিনি দয়ালু

তিনি জন্মহীন বা অজন্ম

তিনি অনন্ত

তিনি নির্বিকার

তিনি অনাদি

তিনি অনুপম

তিনি সর্বধর - সকল কিছুর ধারনকারী

তিনি সর্বেশ্বর

তিনি সর্বব্যাপক

তিনি সর্বঅন্তর্যামী

তিনি অজর

তিনি অমর

তিনি অভয়

তিনি নিত্য

তিনি পবিত্র

তিনি সৃষ্টিকর্তা

কিন্তু পরের অংশে। যা দিয়ে শুরু করলাম তাতে এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে ঈশ্বর জগতের (অভ্যন্তরিন ও বাইরের সকল দিকের) পরিচালক।

এটা জীবন ও জগতের মূল্যায়নের একটা সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মাধ্যমের সংকেত হতে পারে। এবং একদিন আমরা বিশ্লেষন প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হব, ঈশ্বরের বাকী বিশেষন আপনাআপনিই পরিষ্কার হবে।

চল দেখাই ঋগবেদ এই পরম সত্তা সম্পর্কে কি বলেঃ

ঋগবেদ ১/১৬৪/৩০

সেই এক পরম সত্তা যিনি স্বার্থহীন, এই পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করেন, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান এবং দেবগনেরও দেবতা, একমাত্র তিনিই আনন্দের উৎস। যারা তাকে অনুধাবন করে না দুঃখে নিমজ্জিত হয় এবং যারা তাকে অনুধাবন করে তারা শর্তহীন আনন্দ অনুধাবন করে।

প্রশ্ন

আচ্ছা বেদে কয়জন দেবতা ? আমরা শুনেছি যে বেদে অনেক দেবতা আছেন।

বেদ পরিষ্কারভাবে বলে একজন এবং শুধুমাত্র একজনই ঈশ্বর আছেন। বেদে এমন কোন মন্ত্র নেই যেটা বহু ঈশ্বরের কথা বলে।

শুধুমাত্র তাই নয় অধিকন্তু বেদ দেবদূত, নবী, অবতারকে বাতিল করে দেয় যাদের কিনা প্রয়োজন হয় ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যকার এজেন্টের কাজ করতে।

মোটামুটি বর্ণনা দিতে গেলেঃ

বেদের ঈশ্বর = খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর হতে ত্রিত্ববাদের ধারনা বাদ যাবে এবং যীশুর প্রতি আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা বাদ যাবে।

বেদের ঈশ্বর = ইসলামের আল্লাহ্ পর্যন্ত এবং শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদকে গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা বাদ যাবে।

অন্যভাবে বলা যায় যদি কেহ "শাহদা" এর প্রথম অংশ উচ্চারন করে "লা ইলাহা ইল আল্লাহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) কিন্তু দ্বিতীয় অংশ "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" (অর্থাৎ মুহাম্মদ তার বার্তাবাহক) বাতিল করে তাহলে সে বৈদিক ঈশ্বরের ধারনার কাছাকাছি পৌছতে পেরেছে।

ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা শিরক বা মহাপাপ। যদি এই ধারনাটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আল্লাহ্ র সাথে মোহাম্মদ বা গেব্রিয়েলের স্মরন করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়, তাহলে বলা যায় বেদ অনুসারে শিরক পরিহার করা গেল।

প্রশ্ন

বেদে উল্লেখিত বিবিধ দেবতার ব্যাপারটা কি ? ৩৩ কোটি দেবতার বিষয়টাই বা কি ?

"দেবতা" একটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু প্রায়ই (এই শব্দ দ্বারা) ভুলবশত পরম সত্তা ঈশ্বর অর্থ ধরা হয়। অস্তিত্ববান যেকোন কিছু জড় বা জীব যেটা আমাদের সাহায্য করে বা যেটা আমাদের নিকট উপকারী তাকে "দেবতা" বলা হয়। তার মানে এটা নয় যে প্রত্যেকটা সত্তাই ঈশ্বর

এবং আমাদের উচিত তার উপাসনা করা। বেদের কোথাও উল্লেখ নেই যে আমাদের এই সকল বিষয় সমূহকে উপাসনা করতে হবে। তবে হ্যা ঈশ্বর হলেন দেবতাগনেরও দেবতা এবং তাই তাঁকে "মহাদেব" বলা হয়। সুতরাং একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য।

বেদ কখনই ৩৩ কোটি দেবতার কথা বলে না, বরং ৩৩ প্রকার (সংস্কৃত শব্দ "কটি" অর্থ প্রকার)দেবতার কথা বলে। শতপথ ব্রাহ্মনে এটি পরিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হলোঃ

৮ বসু = ভুমি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি যেগুলো মহাবিশ্বের উপাদানকে গঠন করে যেখানে আমরা বসবাস করি।

১১ রুদ্র = ১০ প্রাণ (Life force) পান, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কুর্ম, কুকালা, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং এক প্রান।

১২ আদিত্য = বছরের ১২ মাস

১ বিদ্যুৎ = তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি যেটা আমাদের প্রচুর কাজে লাগে।

১ যজ্ঞ = মনুষ্যকৃত মহান, স্বার্থহীন কর্ম।

এই ৩৩ দেবতার প্রধান নিয়ন্ত্রক হলেন মহাদেবতা বা ঈশ্বর একমাত্র তিনিই উপাস্য শতপথ ব্রাহ্মনের ১৪তম খন্ড অনুযায়ী।

৩৩ দেবতার এই ধারনাটি নিজেই একটি গবেষনাভিত্তিক বিষয় এবং এটি যথাযথভাবে বুঝতে আরো গভীর পড়াশোনা দরকার। যা হোক, সকল বৈদিক গ্রন্থে এটি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তারা (৩৩ দেবতা) ঈশ্বর নন এবং উপাস্যও নন।

ঈশ্বরের আছে প্রচুর সম্পদ। অজ্ঞ জনেরা ভুলবশত ঈশ্বরের সম্পদগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে করেন। ধরা যাকঃ পত্রিকায় দুই ধরনের শিরোনাম হলো একটি শিরোনামে উল্লেখ করা হলো নরেন্দ্র, আরেকটিতে উল্লেখ করা হলো মোদী। তারমানে এটা বোঝায় না ভারতের দুজন প্রধানমন্ত্রী আছে!!

প্রশ্ন

বেদ থেকে এমন কোন মন্ত্র উল্লেখ করা যাবে যেটা বোঝায় যে এক এবং একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন?

বেদে বিভিন্ন মন্ত্র আছে যেটা পরিষ্কার উল্লেখ করেছে এক এবং একজনমাত্র ঈশ্বর আছেন যার কোনো সহকারী নেই, নেই কোন এজেন্ট, নবী বা অধঃস্তন কেউ যিনি ঈশ্বর ও আমাদের মাঝে যোগাযোগ করিয়ে দেন। যেমনঃ

যর্জুবেদ ৪০/১

এই পুরো জগত (তাহাতে) নিহীত আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে এক এবং একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক। কখনো অন্যায় করতে এবং অসৎ উপায়ে ধন কামনা করতে সাহস করবেনা। তার পরিবর্তে সঠিক পথ অনুসরন কর তাঁর আনন্দ উপভোগ কর। সবশেষে তিনিই একমাত্র সকল আনন্দের উৎস।

ঋগবেদ ১০/৪৮/১

একমাত্র ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান এবং সারা জগতের পরিচালনাকারী। একমাত্র তিনিই বিজয় দান করেন এবং জগতের শ্বাশত কারন সকলের উচিত তাঁকে সন্ধান করা যেভাবে শিশুরা তাদের পিতাকে সন্ধান করে। একমাত্র তিনিই আমাদের পুষ্টি ও আনন্দ দান করতে পারেন।

ঋগবেদ ১০/৪৮/৫

ঈশ্বর পুরো জগতকে আলোকিত করেন। তিনি অপরাজেয় ও অমর। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। সকলের উচিত জ্ঞান অন্বেষন ও সেই অনুসারে কাজ করে আনন্দের অনুসন্ধান করা। ঈশ্বরের বন্ধুত্ব হতে দূরে থাকা তাদের কখনোই উচিত নয়।

ঋগবেদ ১০/৪৯/১

সত্যান্বেষীদের প্রতি একমাত্র ঈশ্বরই সত্যজ্ঞান প্রকাশ করেন। একমাত্র তিনিই জ্ঞানের প্রবর্তক এবং আনন্দ অনুসন্ধানী ধার্মিকদের পবিত্র কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও জগতের পরিচালনাকারী। তাই, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন কারো উপাসনা কোরো না।

যর্জুবেদ ১৩/৪

সারা জগতের একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক আছেন। একমাত্র তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুসমূহকে পরিপুষ্ট করছেন। তিনি স্বয়ং আনন্দময়। একমাত্র তিনি আমাদের উপাস্য হতে পারেন।

অথর্ববেদ ১৩/৪/১৬-২১

তিনি দুইটি নন, তিনটি নন, চার, পাঁচ কিংবা ছয়ও নন, আট, নয় কিংবা দশ নন। বিপরীতে তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যাতিত আর কোন ঈশ্বর নেই। সকল দেবতাগন তাহাতে নিহীত থাকে এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই একমাত্র তিনিই উপাস্য, অন্য কেউ নয়।

অথর্ববেদ ১০/৭/৩৮

একমাত্র ঈশ্বর মহান ও তিনিই উপাসনার যোগ্য। তিনিই সকল জ্ঞান ও কর্মের উৎস।

যজুর্বেদ ৩২/১১

ঈশ্বর জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবস্থিত। কোন কিছুই তিনি ব্যাতিত নেই। তিনি স্বয়ং পূর্ণ এবং তাঁর দায়িত্ব পালন করতে কোন এজেন্ট, দেবদূত, নবী বা অবতারের কোন সাহায্যের দরকার নেই। যে ইহা অনুধাবন করতে পেরেছে সে ঈশ্বরকে অর্জন করেছে এবং উপভোগ করে শর্তহীন আনন্দ বা মোক্ষ।

এ ধরনের অসংখ্য মন্ত্র বেদে আছে যাহা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই বর্ণনা করে এবং আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে অন্য কোন সত্তা, অবতার, নবী, দেবদূত অথবা এজেন্টকে আবাহন করা ছাড়াই তাঁকে (ঈশ্বরকে) সরাসরি উপাসনা করতে।

প্রশ্ন

কেন আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত ?

আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত ঠিক যেকারনে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গোলাকার পৃথিবী, পরমানু, অনু, উত্তাপ, তড়িৎ শক্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করি। আমাদের অস্তিত্বমান সকল কিছুকে বিশ্বাস করা উচিত, এবং বাতিল করা উচিত যার অস্তিত্ব নেই তাকে।

জীবনের প্রাথমিক শর্ত হলো "সত্য"= পরমসুখ বা মুক্তির সত্য। এবং সত্যের অর্থ হলো যা অস্তিত্বমান তাকে অনুধাবন করা। তাই আমাদের উচিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, কারন তিনি অস্তিত্বমান।

প্রশ্ন

কিন্তু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারছি। এটা কি সত্যি নয় ?

হ্যা এটা সত্য। একজন দিব্যি জীবন ধারন করতে পারে তড়িৎশক্তিকে বিশ্বাস না করে। এমনকি অনেক আদিবাসী এভাবে জীবন ধারন করেও। কিন্তু সুখকে বর্ধিত করতে হলে আমাদের বিদ্যুৎশক্তিকে বিশ্বাস করাই ভালো যাতে আমরা এটাকে আমাদের কাজে ব্যবহার করতে পারি। অনেকে বলতে পারে তড়িৎশক্তি সম্পর্কে না জেনেও তো অনেকে সুখে থাকতে পারে। তাহলে আমার পাল্টা প্রশ্ন থাকবে কোন বিবেকবান ব্যাক্তি কি রাজী হবে বিদ্যুৎশক্তির আরামদায়ক জীবনকে বিদ্যুৎহীন জীবনের সাথে বিনিময় করে নিতে ? যেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে যে আরামের ব্যবস্থা করা যায় সেটা বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি। জীবনের মূলনীতি হল "জ্ঞান প্রাপ্ত করায় শক্তিকে এবং এভাবেই উচ্চতর সুখকে।" যেকোন বিবেকবান ব্যাক্তি এই নীতিতেই চালিত হন।

একটু ভেবে দেখুন, যদি বিদ্যুৎশক্তির জ্ঞান এতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে পারে তাহলে বিশুদ্ধ সুখের উৎস পরমেশ্বরকে ব্যবহার করার ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং তা হতে উৎসারিত আনন্দ কেমন হতে পারে।

প্রশ্ন

কেউ কখনো ঈশ্বরকে দেখেনি। তাহলে কিভাবে বলব ঈশ্বর অস্তিত্বমান?

কেউ কখনো বিদ্যুৎশক্তিকে দেখেনি, উত্তাপকে দেখেনি বা এমনকি অতিপারমানবিক অংশগুলোকে দেখেনি। কেউ কখনো ফোটন বা কোয়ার্ককে দেখেনি। কেউ কখনো আলোক তরঙ্গ, উত্তাপের বিকিরন দেখেনি। তাহলেও আমরা কেন বলি তারা অস্তিত্বমান?

আমরা জানি ফোটন অস্তিত্বমান কারন আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই যেটা ব্যাখ্যা করা যায় না। একইভাবে এটা বিদ্যুৎশক্তি, অতিপারমানবিক অংশ, উত্তাপ ও আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রেও সত্যি। ঠিক এভাবেই!

আমরা নির্বস্তুক বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করি কারন আমরা এর প্রভাবগুলোকে দেখতে পাই। চক্ষুগুলো হলো জগতকে অনুধাবন করার যথাযথপ্রায় (শতভাগ যথাযথ নয়) ইন্দ্রিয়। যা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাইনা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারি। কিন্তু এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপও একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে ক্ষুদ্রাংশগুলো দেখতে পায় না। অন্যান্য অনুভুতির ব্যাপারেও যেমন শোনা, অনুভুতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিষয়টা সত্য। এইভাবে পুরো আধুনিক বিজ্ঞান আমরা যা দেখি বা শুনি তার উপর ভিত্তি ধরেনা বরং ভিত্তি ধরে এর প্রভাবের মাধ্যমে আমরা কি অনুধাবন করতে পারি। এবং এটি (আধুনিক বিজ্ঞান) যা করে তা হলো এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে একটা বিশেষ মডেল সৃষ্টি করে।

এভাবেই এই সকল ফোটন, ইলেকট্রন ও কোয়ার্ক এগুলো প্রকৃতপক্ষে মডেলের উপাদান যেটা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এই মডেলগুলোরও আরো গভীরে গেলে সেখানে কিছু বাস্তবতা আছে যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের এই মডেলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে না। এবং এই বাস্তবতাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে এমনকি এই সকল মডেলগুলোর পিছনের কারন ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে।

প্রশ্ন

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যা পরিমাপ করা যায়। আমরা ঈশ্বরকে পরিমাপ করতে পারি না, তাহলে আমরা কিভাবে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করব?

এটা আরেকটা কল্প কথা। পরিমাপ হলো তৃতীয় ধাপ। প্রথম ধাপ হলো পরোক্ষভাবে নিরীক্ষন করা, দ্বিতীয় ধাপ হলো প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষন করা এবং তারপর আসে পরিমাপের বিষয়টি। প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষন ও পরিমাপ করার ক্ষমতাটি নির্ভর করে আমরা কত সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে পারছি তার উপর। নিউটনের টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিলো না, এমনটা আমরা দাবী করতে পারি না! বর্তমানে আমরা বৃহস্পতি গ্রহের অনেক অনেক উপগ্রহ দেখতে পাই অধিকতর শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে। এখন, ঈশ্বর হলেন একটা ধারনা যেটা ক্ষুদ্র কনা বা তরঙ্গের ধারনার চাইতেও অনেক সুক্ষ্ম। যে যন্ত্রপাতিগুলো আমরা ব্যবহার করি এবং জ্ঞান অর্জন করি সেগুলো শুধুমাত্র নিরীক্ষন করতে পারে ও পরিমাপ করতে পারে বস্তুগত বিষয়গুলোকে, খুব বেশি হলে ক্ষুদ্রকনা ও তরঙ্গকে। ঠিক যেমন, টেলিফোন সংযোগের মাধ্যমে দিল্লীতে বসে নিউইয়র্কে থাকা একটি গোলাপের গন্ধ শুঁকার প্রচেষ্ঠা একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত, একইভাবে বস্তুগত যন্ত্রপাতি দ্বারা ঈশ্বরকে নিরীক্ষা করা ও পরিমাপ করার চেষ্টা করাটা এক কথায় অপচয়। যা হোক, যদি আপনি ঈশ্বরের প্রভাবকে অনুধাবন চান, এটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়।

প্রশ্ন

যদি এটাই হয়, তবে কেন আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে?

না, আধুনিক বজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। কিন্তু এই বিষয়টি আধুনিক পদার্থ বিদ্যার আওতার বাইরে। নিউটন, আইনস্টাইন ইত্যাদি সকল মহান বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়ুন। কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। বাস্তবে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী। আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বরের সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে অস্বীকার করে যেগুলো যুক্তি, প্রমানিত নিরীক্ষন ও গবেষনা বিরোধী।

ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে বাইবেলীয় আস্তিকতার ধারনার প্রতিক্রিয়ায়। যা হোক, নতুন নতুন গবেষনা সংগঠিত হচ্ছে বাইবেলের অনেক অনেক ধারনার আসল সত্য প্রকাশ হচ্ছে। এভাবেই, বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হচ্ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞান বাইবেলীয় ঈশ্বর দর্শনকে বাতিল করে দিয়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ গবেষনার যাত্রাকে চলমান রাখতে। এবং তখনই ঈশ্বরকে বাতিল করার বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞানের অধিক আলোচনার বিষয় হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে ভক্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক রক্ষনশীল খ্রিস্টান ও ইসলাম থেকে, এবং তাই (খ্রিস্ট ও ইসলামী মতবাদের) ঈশ্বরকে বাতিল করাটা হয়ে উঠেছে এর (আধুনিক বিজ্ঞানের) বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। সাধারন কথায়

আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বাতিল করেছে যার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এটা (আধুনিক বিজ্ঞান) বাতিল করেনি এবং করতে পারেনি ঈশ্বরকে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন

অস্তিত্ব নেই এমন ঈশ্বর বলতে কি বুঝিয়েছেন ?

. ঈশ্বর যিনি বৈশিষ্ট্য ও আচরনে মানুষের মত।

. ঈশ্বর যিনি সর্বভুতে বিরাজমান অবস্থিত নন।

. ঈশ্বর যিনি হস্তক্ষেপ করেন লোকজনের প্রতিদিনকার বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করেন।

. ঈশ্বর যিনি সময়সুযোগে অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

. ঈশ্বর যিনি তাঁর অনুসারীদের পাপকে ক্ষমা করেন।

. ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে স্বর্গে ও নরকে পাঠান।

. ঈশ্বর যিনি তাঁর বার্তাবাহক, নবী বা অবতার পাঠান।

. ঈশ্বর যিনি পরিবর্তন হন এমনকি সামান্য হলেও।

. ঈশ্বর যিনি চতুর্থ বা সপ্তম আকাশে অবস্থান করেন।

. ঈশ্বর যিনি কোন নির্দিষ্ট বই বিশ্বাস না করার জন্য শাস্তি দেন।

. ঈশ্বর যিনি জগতের শেষ বা ধ্বংসের পরে বিচার দিবসের জন্য অপেক্ষা করেন।

. ঈশ্বর যিনি জগতকে সৃষ্টি করেছেন কয়েক ঘন্টা বা দিনে।

. ঈশ্বর যিনি দেবদূতদের সৃষ্টি করেছেন।

. ঈশ্বর যিনি কোন শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেন।

ঈশ্বর যার এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে এককথায় তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। বেদ অথবা আধুনিক বিজ্ঞান এটি বিশ্বাস করেনা কারন এটি যুক্তি বিরোধী।

প্রশ্ন

কিভাবে আমরা ঈশ্বরের লক্ষনগুলো বুঝব ?

চারটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিক বিশ্লেষন ও নিরীক্ষনের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের লক্ষনগুলো বুঝতে পারব।

প্রশ্ন

প্রথম দিক কোনটি ?

মহাবিশ্বের নিয়মঃ শুধুমাত্র ভাবুন, একটি আইন বা নিয়মবিধি আসলে কি ? যেকোন ব্যাক্তি বা বস্তু যেটা যথাযথভাবে পুনরায় পুনরায় একই ঘটনা ঘটানোর প্রদর্শন করে এটাই আইন বা নিয়ম । তাই এখানে প্রশ্নটা আসে, কে বা কি এই নিয়মগুলোকে কার্যকর করছে ? অন্যভাবে বললে, যদি মহাকর্ষ শক্তি, তড়িৎচুম্বক শক্তি, শক্তিশালী ও দূর্বল বল এই চারটি মৌলিক শক্তি যদি এই জগতকে নিয়ন্ত্রন করে, তবে এটার পিছনে মূল কারনটা কি ? পদার্থবিদরা এগুলোকে একত্রিত করতে ব্যার্থ হয়েছেন । কিন্তু বলছেন ভবিষ্যতে সফল হবেন। আচ্ছা মনে করি আমরা এই শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি বললাম। এখন আমার প্রশ্নটা হবে "এই ঐক্যবদ্ধ বলের উৎসটা কি ?" এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি বা শক্তিগুলো আরোপিত হবে ঈশ্বরের প্রতি (অর্থাৎ এই শক্তিগুলো তাঁর) । তাই ঈশ্বর এই শক্তিগুলো এতই যথাযথভাবে চালনা করছেন যে আমরা এটা পরিমাপ করতে পারছি, তারপর আমরা এটাকে "আইন" হিসেবে নিতে পারছি । তাই ঈশ্বর হলেন সেই সত্তা যিনি এই জগতকে পরিচালনা করছেন।

প্রশ্ন

দ্বিতীয় দিক কোনটি ?

চেতনাঃ দ্বিতীয় দিক আসে চেতনা থেকে । আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার উৎস খুজে পেতে ব্যার্থ হয়েছে । এটা জানায় যে একটা মানব/প্রাণী দেহ ভালোভাবে কাজ করে, প্রায় অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায়। তাহলে প্রশ্ন আসে, এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটা কিভাবে চালু থাকে ? কিভাবে এটি প্রথম স্থানে আসে ? তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দেয়।

এছাড়াও, ব্যাথা ও আনন্দের উৎস যেটা বিষ্ময়কর মনস্ত্বাত্তিক বিষয়ের উৎস এটা এমনকিছু যেটা আধুনিক বিজ্ঞান পরিমাপ করতে অক্ষম হয়নি কারন এর যন্ত্রপাতিগুলো ক্ষুদ্রাংশ এর তুলনায় অধিক সুক্ষ্মতর হতে পারে না। এবং এই চেতনা এর চেয়ে বেশি সুক্ষ্ম । রাসায়নিক বিক্রিয়া চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনা । এই বিষয়ের উপর যে কোন আধুনিক বই পড়ুন আপনি জানতে পারবেন এটি আধুনিক বিজ্ঞানকে এড়িয়ে যায়।

এখন তারা বলে যে চেতনা সমগ্র ব্যবস্থাটায় (অর্ন্তনিহীত) রয়েছে এবং এটি মস্তিষ্কের যেকোন একটি অংশে অবস্থিত নয় । কোন বিষয়টি প্রাণী বা মানুষের ব্যথার অনুভুতি

জাগায় এবং কোন নিউরনগুলো সিদ্ধান্ত নেয় উদ্দীপিত করতে এবং কখন, এটা এখন পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের আওতার বাইরে ।কিভাবে মস্তিষ্ক কাজ করে, এবং কিভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত সক্রিয়তায় পরিবর্তন হয়, এবং কোনটি আমাদেরকে বিভিন্ন আবেগ অনুভুত করায় এবং কে এই আবেগ অনুভব করে, এই প্রশ্নগুলো আছে যেগুলোর কোন উত্তর আধুনিক বিজ্ঞান দিতে পারে না । একজন বিখ্যাত নিউরোসার্জন দ্বারা (পরিচালিত) Human Body Mind Power নামক বিবিসির একটি ডকুমেন্টারীতে তিনি স্বীকার করেন যে আমরা যাকে চেতনা বলি সেটি আত্মাকে ইঙ্গিত করে ।

বেদ অনুসারে, এই সত্তা যা ব্যথা / আনন্দ অনুভব করে তা হলো আত্মা । যে সত্তা চেতনা এবং চেতনাহীনদের (প্রাণহীনদের) পরিচালনা করেন তিনি হলেন ঈশ্বর । কারণ ঈশ্বর চেতন সত্তাগুলোকে পরিচালনা করেন, ঈশ্বরও চেতন । যেহেতু ঈশ্বর এবং আত্মা বস্তুগত বা দৈহিক সত্তার চেয়ে সূক্ষ্ম, তাই তারা অবিনশ্বর এবং তাই জন্মহীন এবং মৃত্যুহীন । কিন্তু এইটি অপরদিকে তাদেরকে তাদের অপরিমাপযোগ্য বা অনিরীক্ষনযোগ্য করে তোলে।

প্রশ্ন

আচ্ছা ঠিক আছে, তৃতীয় দিকটি কি ?

কারণ-প্রভাব শৃঙ্খল: এমনকি যদিও আধুনিক বিজ্ঞান অনেক তত্ত্ব ও আইন তৈরি ও বিকশিত করেছে, তবে তা সেগুলোকে (সেই তত্ব ও আইনকে) কারণ-প্রভাব শৃঙ্খলে সুসামঞ্জস্যভাবে একত্রিত করতে সক্ষম নয়। উদাহরণস্বরূপ, চারটি মৌলিক বল রয়েছে এমনটা বলা হয় । কিন্তু কিভাবে এই বল পারষ্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় জটিলতার সাথে একটি জীবন্ত শরীর এবং মহাবিশ্বের গঠন তৈরি করে, এটি একটি রহস্য ।

ক্ষুদ্রতম কণার এবং মহাবিশ্বের নিয়মসমূহ, কোয়ান্টাম ও আপেক্ষিকতা সূত্র একে অপরের বিপরীত। যখন মহাবিশ্বের বয়স লাল-পরিবর্তনের (red-shift) মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, তখন নির্দিষ্ট তারকাগুলোর বয়সের তুলনায় এর মান অনেক কম হয় যখন পরিমাপ করা হয়েছিলো প্রতিক্রিয়া হারে পরিবর্তনের হারের মাধ্যমে । শেষের প্রক্রিয়াটিকে মনে করা হয়েছিলো অনেক যথাযথ, কিন্তু এটি প্রমান করে তারকাগুলো মহাবিশ্বের চেয়ে অনেকটা পুরোনো ! যেন, সন্তানের বয়স মাতাপিতার তুলনায় বেশি ! আধুনিক বিজ্ঞান তার নিরীক্ষার দ্বারা নির্দিষ্ট বলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেনেছেন, কিন্তু জানতে পারেননি এটি কিভাবে রূপান্তরিত হয় ।

. মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে

. প্রতিটা প্রাণী / মানবের চেতনাশক্তিতে

. প্রাণী জগতের সামাজিক আচরনে।

নিজ প্রজাতির একটি শিশুর জন্য ঐ প্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সুরক্ষার চেতনার উপস্থিতির মত একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

প্রশ্ন

আচ্ছা ঠিক আছে, চতুর্থ দিকটি কি ?

মাতৃগর্ভে থাকা বাচ্চাঃ মাতৃগর্ভে থাকা বাচ্চা এমনকি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না। এটা তার খাবার, বাতাস সকলকিছু পায় নাভিরজ্জুর মাধ্যমে। এবং এটি এমন একটা পদ্ধতিতে বিকশিত হয় যখন সে গর্ভের বাহিরে আসে ব্যবস্থাটা ইতোমধ্যেই তৈরী থাকে তার কার্যক্রমগুলোকে সহায়তা করতে যেমন নিঃশ্বাস নেওয়া, হৃদপিন্ড-ফুসফুস প্রক্রিয়া ইত্যাদি। কিভাবে এমন একটি 'ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত' স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে ? সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সচেতন সত্তা সকল কিছুতে এটি পরিকল্পনা করেছেন, এটি মেনে নেয়া ছাড়া এটার কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

প্রাণের এবং জগতের যেকোনো দিকের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের ফলে (এই জ্ঞান) অর্জিত হবে যে এটা কেবল এলোমেলোভাবে ঘটছে এমন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়। এই সকলকিছু অবশ্যই একটি পরম চেতন শক্তি পরিচালনা করছেন।

প্রশ্ন

ঠিক আছে, ঈশ্বর আছেন এই আইডিয়াটা আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি কিভাবে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করব।

তুমি ঈশ্বরকে অনুধাবন করতে পার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে।

প্রশ্ন

কিন্তু সরাসরি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাহলে তুমি কিভাবে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরের ধারনাকে) প্রতিষ্ঠিত করবে ?

প্রমাণের অর্থ ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলি থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনার মাধ্যমে নির্ধারিত সুস্পষ্ট জ্ঞান। তবে লক্ষ্য করুন যে ইন্দ্রিয়গুলি বৈশিষ্ট্য, গুন, ধর্মগুলি ধরতে পারে কিন্তু "এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণকে" ধরতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন এই বইটি পড়েন, তখন আপনি অগ্নিবীরের অস্তিত্বকে ধরেন না, শুধুমাত্র কিছু ছবি আপনার স্ক্রীনে / পৃষ্ঠায় আসছে যা আপনি অর্থপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে

ব্যাখ্যা করেন। এবং তারপর আপনি উপসংহারে আসেন যে এই বইয়ের কোনো না কোনো লেখক আছেই এবং আপনি দাবি করেন অগ্নিবীর এর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। তাই এটি হলো 'পরোক্ষ প্রমান' এমনকি যদিও এটিকে 'প্রত্যক্ষ' বলে মনে হয়।

একইভাবে এই পুরো সৃষ্টি যা আমরা দেখা এর বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করে।

যখন আপনি একটি ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত ইনপুট কোন একটি বিষয়ের সাথে সরাসরি সংযোগ করতে পারবেন, তখন "সরাসরি প্রমাণ আছে" আপনি এমন দাবি করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি একটি আম খান, তখন আপনি মিষ্টির বৈশিষ্ট্যকে অনুভব করেন এবং এটিকে আমের সাথে জুড়ে দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আপনি এমন "প্রত্যক্ষ প্রমানের" সহযোগী হন শুধুমাত্র ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয় দ্বারা যেটি ঐ বৈশিষ্ট্যকে নিরীক্ষন করেছে। এভাবেই পূর্বের উদাহরণ থেকে বলা যায় আপনি শ্রবনেন্দ্রিয় বা কানের মাধ্যমে আমের প্রত্যক্ষ প্রমান পাবেন না, আমের প্রত্যক্ষ প্রমান পাবেন শুধুমাত্র জিহবা, নাক বা চোখ দিয়ে। আরো, বাস্তবতায় এটাও 'পরোক্ষ প্রমান' যদিও এটাকে আমরা 'প্রত্যক্ষ প্রমান' রূপে মেনে নিয়েছি সহজভাবে বোঝার স্বার্থে।

এখন, ঈশ্বর যেহেতু সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিদ্যমান সত্তা, তাই চোখ, নাক, জিহ্বা, ত্বক বা কান মত মোটা ইন্দ্রিয়ের অঙ্গগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের 'সরাসরি প্রমাণ' পাওয়া অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এমনকি অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমেও অতিআনবিক কণা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা অতিস্বনক শব্দ (ultrasonic sound) শুনতে পাই না এবং আমরা প্রতিটি অণুর স্পর্শ অনুভব করতে পারি না।

অন্য কথায়, এই অস্পষ্ট ও দুর্বল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা অসম্ভব, ঠিক যেমন শ্রবনেন্দ্রিয় বা কানের মাধ্যমে আমকে অনুভূত হতে পারেনা বা সাবটোমিক কণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা।

প্রশ্ন

এমন কোন পথ আছে কি যাতে আমরা সরাসরি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি ?

ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে একমাত্র যে ইন্দ্রিয়, তা হলো মন। যখন মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিক্ষোভমুক্ত থাকে (সব সময় হাজার হাজার ভাবনা আসছে) এবং ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত করা হয়, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে প্রমানিত হতে পারে বুদ্ধির মাধ্যমে, সেই একই ভাবে যেমনটা এটা আমের স্বাদের প্রমান পেয়েছিলো।

ঈশ্বরকে অনুধাবন করা জীবনের লক্ষ্য, এবং একজন যোগী এটাই করার উদ্যোগ নেয় মনকে নিয়ন্ত্রন করার নানা কৌশলের মাধ্যমে, যেখানে কিছু বিষয় অনুশীলন করা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন অহিংসা, সত্যান্বেষা, ধৈর্য্য, সকলের জন্য শান্তি অন্বেষন, উচ্চ মানবিক চরিত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মনুষ্যগনের মধ্যে একতা ইত্যাদি।

একটি উপায়ে, প্রতিদিন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সরাসরি প্রমাণ ইঙ্গিত পাই । যখন আমরা চুরি, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতার মতো কোনও ভুল কাজ করতে চেষ্টা করি, তখন আমরা ভয়, লজ্জা, সন্দেহের আকারে সেই অস্পষ্ট 'ভেতরের নির্দেশ' শুনতে পাই। এবং যখন আমরা অন্যকে সাহায্য করার মতো মহান কাজে নিয়োজিত থাকি, একটি শিশুকে আশীর্বাদ করি, তখন আমরা আবার সেই 'ভেতরের নির্দেশ' শুনতে পাই ভয়হীন, সন্তুষ্টি, উৎসাহ এবং সুখের অনুভুতির আকারে।

এই 'ভিতরের নির্দেশ' ঈশ্বর থেকে আসে । প্রায়শই আমরা এটির শ্রুতিগ্রাহ্যতা হ্রাস করি চারপাশের বোকা প্রবণতার উচ্চশব্দের DJ মিউজিকের মাধ্যমে এই নির্দেশনাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে । কিন্তু তারপর আমরা সকলে, সময়ে সময়ে, অনুভব করি এই 'ভেতরের নির্দেশ' আরো জোরালো হচ্ছে এবং তখনই এটা হয় যখন চারপাশ তুলনামূলকভাবে নীরব থাকে । এবং যখন ব্যাক্তি নিজেই নিজেকে মানসিক বিক্ষিপ্ততা থেকে শুদ্ধ করেন এবং DJ ক্লাব থেকে দূরে চলে যায়, এই ব্যাক্তি নিজেই নিজের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমান পেতে পারে সেই সাথে ঈশ্বরকেও প্রমাণ করতে পারে।

অতএব, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রমাণের মাধ্যমে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেমনভাবে অন্য সত্তাগুলো আমাদের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে ।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কোথায় বাস করেন ?

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান অতএব তিনি সব জায়গাতেই আছেন । যদি ঈশ্বর কোন একটা বিশেষ স্থানে যেমন কোন বিশেষ আকাশে অথবা কোন বিশেষ আসনে বাস করেন, তিনি তবে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল কিছু পরিচালনাকারী, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা হতে পারবেন না । আমরা কোন স্থানে উপস্থিত না থেকে সে স্থানের কর্মগুলো সম্পাদন করতে পারব না।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি একস্থানে থেকে জগতকে পরিচালনা করছেন না ঠিক যেমন সূর্য অনেক দূর থেকে পৃথিবীকে আলোকিত করছে ?

ঈশ্বর একস্থানে থেকে জগতকে পরিচালনা করছেন ঠিক যেমন সূর্য অনেক দূর থেকে পৃথিবীকে আলোকিত করছে অথবা যেমন আমরা রিমোটের মাধ্যমে টিভিকে নিয়ন্ত্রন করি এগুলো ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি। কারন সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে বা রিমোট কন্ট্রোল টিভিকে চালনা করতে পারে বিকিরন তরঙ্গের মাধ্যমে যেটা অন্তবর্তী মহাশূণ্যের মধ্যে ভ্রমন করতে পারে। শুধুমাত্র আমরা এটাকে দেখতে না পাওয়ায় আমরা রিমোট কন্ট্রোল বলি। বাস্তবে রিমোট কন্ট্রোলের মতন কিছু নেই। তাই, বাস্তবতাটি হলো ঈশ্বর পরিচালনা করতে পারেন, এর দ্বারা বোঝায় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন এটিকে পরিচালনা করতে।

উপরন্তু, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন কেন তিনি নিজেকে একটি ছোট স্থানে সীমাবদ্ধ রাখবেন? ঈশ্বর যদি নিজেকে সীমিত করেন, এটি ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। খ্রিস্টানরা বলে যে ঈশ্বর চতুর্থ আকাশে আছেন এবং মুসলমানরা বলে যে আল্লাহ সপ্তম আকাশে আছেন। এবং তাদের অনুসারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের সঠিক প্রমাণ করার জন্য। এটা কি এমন যে, গড ও আল্লাহ আলাদা আলাদা বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে তাঁরা তাদের রাগান্বিত অনুগামীদের মত যুদ্ধে না জড়িয়ে পরেন?

প্রকৃতপক্ষে, এইগুলো বালকসুলভ আলোচনা। যেখানে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন কোন কারণ নেই যে তিনি নিজেকে মহাবিশ্বের একটি ছোট অংশে সীমিত করে ফেলবেন। এবং যদি তিনি তা করেন, তিনি সর্বশক্তিমান রূপে বর্ণিত হতে পারেন না।

প্রশ্ন

এটা কি বোঝায় ঈশ্বর নোংরা জিনিস যেমন এলকোহল, প্রস্রাব ও মলমূত্রেও আছেন?

সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। ঈশ্বর এই জিনিসগুলির বাইরেও আছেন, কিন্তু এই জিনিসগুলি ঈশ্বরের বাইরে বিদ্যমান নেই। অতএব, বিশ্বের সব কিছু ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

একটি মোটামুটি উপমা দিতে গেলে, আমরা ঈশ্বরের মধ্যে আছি ঠিক যেমনভাবে জলের একটি পাত্রের মধ্যে কাপড় একটি টুকরা থাকে। কাপড়ের ভেতরে, বাহিরে এবং সর্বত্র জল আছে। কাপড়ের এমন কোনও অংশ নেই যা শুকনো বা জল দিয়ে ভেজা নয়, তবে কাপড়ের পাশাপাশি জল কিন্তু বাইরেও আছে।

কোনো কিছু আমাদের জন্য নোংরা বা ভাল সেটি নির্ভর করে এটির প্রতি আমাদের দায়িত্ব কেমন তার উপর। সেই একই অণুর সেট মজাদার আম গঠন করে, তা আমরা খাই এবং যখন নানাভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ও অন্য রাসায়নিক পদার্থের সাথে ক্রিয়া করে এবং

মলমুত্র গঠন করে, তখন সেটা আমাদের জন্য নোংরা হয়ে যায় । কিন্তু মূলত, এই সমস্ত কিছু নিছকই প্রকৃতির কণার বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ। যেহেতু আমাদের এই পৃথিবীতে একটি মিশন আছে, আমরা প্রতিটি জিনিস বিশ্লেষণ করি মিশনের সহিত সঙ্গতি রেখে এবং কিছু গ্রহণ করি বাকীটা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা প্রত্যাখ্যান করি যা আমাদের জন্য নোংরা, বা আবর্জনা, এবং আমরা গ্রহন করি আমাদের জন্য যা ভাল । কিন্তু ঈশ্বরের জন্য, এই ধরনের করনীয় কিছু নেই এবং অতএব, তার জন্য কিছুই নোংরা নয় । বিপরীতভাবে, তাঁর কর্তব্য আমাদের থেকে আলাদা, যাতে আমাদেরকে সহায়তা করা যাতে আমরা যথাযথভাবে আনন্দ অর্জন করতে পারি এবং তাই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে তাঁর জন্য অস্পৃশ্য কিছুই নেই।

যদি আপনি অন্য দৃষ্টান্তের দিকে তাকান, তবে ঈশ্বর একজন আদুরে সমাজকর্মীর মতো নন, যিনি এয়ার কন্ডিশনাল অফিসে বসে দূরবর্তী অবস্থানের পরিকল্পনা করতে পছন্দ করেন কিন্তু যে বস্তিতে প্রকৃত সামাজিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে সেগুলি পরিদর্শন থেকে বিরত থাকবেন। বিপরীতে তিনি, আমাদের উপকারের জন্য নোংরাতম জায়গা পরিচালনা করতে বিদ্যমান থাকেন ।

এবং যেহেতু তিনি একা সবচেয়ে নিখুঁত, যদিও তিনি সর্বত্র আছেন এবং তাঁর মধ্যেই সবকিছু আছে, তা সত্ত্বেও তিনি আলাদা এবং এগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি দয়ালু বা ন্যায় বিচারক ?

ঈশ্বর দয়া ও ন্যায়বিচারের উপমা।

প্রশ্ন

কিন্তু এইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য । উদারতা মানে একজন অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া এবং ন্যায়বিচার মানে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান। উভয় বৈশিষ্ট্য কিভাবে একই সাথে বিদ্যমান হতে পারে ?

দয়া এবং ন্যায়বিচার এক এবং একই কারণ উভয়েই একই উদ্দেশ্য সাধন করে ।

দয়া করা অর্থ অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া বোঝায় না । কারণ যদি অপরাধীকে ক্ষমা করা দেয়া হয়, অনেক নির্দোষ মানুষ তার শিকার হয়ে যাবে। সুতরাং, যদি কোন অপরাধীকে বিচার না করা হয়, তবে একজন বিচারক নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষে দয়ালু হতে পারবেন না ।

এটা অপরাধীদের জন্য ন্যায়বিচারও হবে না কারণ তাতে সেই অপরাধী আরও অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ডাকাতকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে সে বেশ কিছু নির্দোষ ব্যক্তিদের ক্ষতি করবে । এবং যদি তাকে কারাবন্দী করা হয়, তবে এটি কেবল নির্দোষদের ক্ষতি করা রুখে দেবে শুধু সেটিই নয় আরো বরং তাকে নিজেকে উন্নত করার সুযোগ দেবে এবং সে আর অপরাধ করবে না । তাই ন্যায় বিচার প্রত্যেকের এবং সকলের জন্য দয়াতেই কেবলমাত্র নিহীত থাকে ।

প্রকৃতপক্ষে, দয়াশীলতা ব্যাপারটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে এবং ন্যায়বিচার ব্যাপারটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে । যখন ঈশ্বর একজন অপরাধীকে শাস্তি দেন, তিনি সেটা করেন অপরাধীকে আরো অপরাধ করা থেকে প্রতিরোধ করতে । এবং তিনি নির্দোষ মানুষকে তাদের কোন অপরাধ ছাড়াই শাস্তি পাওয়া থেকে রক্ষাও করেন । এভাবে, ন্যায়বিচারের সকল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলের প্রতি দয়া।

বেদ অনুযায়ী, এবং গবেষনা অনুযায়ী, দুঃখের উৎস হল অজ্ঞতা যা একজন ব্যাক্তিকে "অপরাধ" নামক ভুল কাজ করায় । তাই যখন একজন ব্যাক্তি এইরকম অন্যায় কাজ করে, তখন ঈশ্বর তার স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন এবং তার অজ্ঞতা দূর করার এবং দুঃখ মুছে ফেলার সুযোগ করে দেন ।

শুধুমাত্র "সরি" বলাটা ঈশ্বরের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট না। পাপ বা অপরাধের উৎস অজ্ঞতা । এবং যতক্ষন পর্যন্ত অজ্ঞতা দূর করা যাচ্ছে না, আত্মা তার কর্মের জন্য যথাযথ শাস্তি বা পুরষ্কার পেতে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যাবে । এই ন্যায়বিচারের সকল উদ্দেশ্য হল আত্মাকে পরমানন্দের উপহার প্রদান করা এবং এটাই সেই আত্মার প্রতি তার দয়াশীলতা ।

প্রশ্ন

তার মানে কি ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করবেন না? যদি তা হয়, ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম আরও ভাল । সেখানে যদি আমি স্বীকার করি বা দুঃখিত বলি, আমার সমস্ত অতীতের রেকর্ড মুছে ফেলা হয়, এবং আমি নতুন সুযোগ পাই।

ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন । তাঁর ক্ষমা নিহীত আছে আমাদের কর্মের সঠিক ফলাফলের উপর, যা তিনি দিয়েছেন এবং আপনার অতীতের রেকর্ডগুলি মুছে দেওয়ার মধ্যে (ক্ষমা নিহীত) নয় ।

যদি তিনি আমাদের অতীতের রেকর্ডগুলি মুছে ফেলতেন, তবে তিনি আমাদের কাছে সবচেয়ে অবিচার ও নিষ্ঠুরতা করতেন । কারণ এই ক্ষেত্রে, তিনি আমাদেরকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করার অনুমতি দিয়েছেন, এমনকি যখন আমরা বর্তমান শ্রেণীর পাস করার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারিনি। এবং এই প্রক্রিয়াতে, তিনি অন্যদের সাথে অবিচার করেন যারা আমাদের সাথে পারষ্পরিকভাবে সক্রিয় ।

ক্ষমা করা মানে আপনার যোগ্যতা উন্নত করার সুযোগ প্রদান করা এবং আপনাকে ১০০% নম্বর দেওয়া নয় যখন আপনি শূন্য পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন । এবং ঠিক এটাই ঈশ্বর করেন । এবং মনে রাখবেন, যোগ্যতার উন্নতি এক মুহূর্তে বা 'দুঃখিত' এই এক শব্দ দ্বারা ঘটতে পারে না । এটি একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে আত্মনিয়োজিত অনুশীলন এবং প্রচেষ্টার দাবি করে। শুধুমাত্র অলস লোক সংক্ষিপ্ত পথ খোঁজে চাইতে যেমন অনেকে পড়াশুনা ছাড়াই শতভাগ নাম্বার পেতে চায় ।

দুর্ভাগ্যবশত, যারা তাদের ধর্মের দিকে মানুষকে এই বলে আকর্ষনের চেষ্টা করে যে - ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তারা আসলে নিজেদের এবং জনগণকে বোকা বানাচ্ছেন । ধরুন কারো ডায়াবেটিস আছে । এটা কি শুধু 'দুঃখিত' বললেই দূর হয়ে যায় ? যখন একটি শারীরিক রোগকে মুক্ত করতে 'দুঃখিত' বলার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করা লাগে, কিভাবে মানব মনের মত একটা জটিলতর বিষয়ের ক্ষেত্রে 'দুঃখিত' বললেই মুক্ত হয়ে যায় ?

এই (আব্রাহামিক) মতাদর্শগুলোতে একটি বিরাট ত্রুটি আছে, তারা এক জীবনে বিশ্বাস করে এবং পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেনা । তাই তারা মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কৃত্রিম 'সংক্ষিপ্ত তাড়াতাড়ি' সূত্র তৈরি করতে চায় এবং মানুষরা তাদের সাথে একমত না হলে তারা তাদেরকে নরকের ভয় দেখায় ।

বৈদিক দর্শন অনেক বেশি স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য । সেখানে না আছে এমন কোন জাহান্নাম যেখানে আপনি চিরকালের জন্য জ্বলতে, আল্লাহ্ (যিনি মায়ের মতো প্রেমময়) কর্তৃক নিক্ষেপিত হবেন, আর না তিনি আপনাকে আপনার প্রাপ্য সেই সুযোগ থেকে বিরত করেন - যেটাতে আপনি প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে আপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন । সবশেষে, কোনটি অধিকতর সন্তোষজনক?

জাল মার্ক শীটের মাধ্যমে প্রথম স্থানটি অধিকার করা ? যেখানে আমরা জানি যে প্রকৃতপক্ষে আমরা শূন্য পেয়েছিলাম ? না কি

কঠোর পরিশ্রমে এবং মধ্যরাতের তেল জ্বালানোর মধ্য দিয়ে গর্বিত প্রথম স্থান অধিকার করা ? যেখানে আমরা জানি যে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বিষয়টিতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে !

সুতরাং বলা যায় বেদে, সাফল্যের জন্য কোন সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘমেয়াদি পথ নেই। শুধুমাত্র সঠিক পথ আছে! এবং কোনও বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারনাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পথের চেয়ে এই সাফল্য অনেক বেশি সন্তুষ্টকর!

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি সাকার না নিরাকার?

বেদ ও সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী তিনি নিরাকার। যদি তার একটি আকার থাকতো তবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান হতে পারতেন না, কারণ আকার একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অস্তিত্বকে সূচিত করে। এবং তাই, সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সাকার হলে) তাঁর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট সীমানার পরে থাকা উচিত নয়।

ঈশ্বরের আকার শুধুমাত্র দেখা যাবে যদি তিনি স্থূল হন, কারন আলোক তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে এমন কোনো বস্তুর চেয়ে কোন বস্তু সুক্ষ্ম হলে সে সুক্ষ্ম বস্তুটিকে আর দেখা যায় না। এখন বেদ স্পষ্টভাবে বলে ঈশ্বর সুক্ষ্মতম, ফাঁকহীন এবং সমভাবে সর্বব্যাপী। অতএব, তাঁর কোনো আকার থাকতে পারে না।

যদি ঈশ্বর একটি আকার থাকে, তার মানে কেউ তার আকার তৈরী করেছেন। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। যদি কেউ বলেন যে ঈশ্বর নিজেই নিজের আকার বানিয়েছেন, এর অর্থ তিনি আগে নিরাকার ছিলেন।

যদি আপনি বলে থাকেন যে ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই, এটা সম্ভব নয় কারণ এটা দ্বন্দ্বমূলক।

যদি আপনি বলে থাকেন যে তিনি সময়ে সময়ে দিব্য রূপ গ্রহণ করেন, দয়া করে দিব্য রূপ বলতে কি বোঝায় তা বোঝান। ধরুন ঈশ্বর একটি মানুষের দিব্যরূপ গ্রহণ করলেন। এখন, আপনি কিভাবে ঈশ্বর পরমাণু এবং অ-ঈশ্বর পরমাণুর সীমানা নির্ধারণ করবেন? উপরন্তু, যেহেতু তিনি একই ঘনত্বসহ (অভিন্নভাবে) সর্বত্র উপস্থিত, তাহলে আমরা মানব-ঈশ্বর এবং বাকি জগতের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করব? আর যদি ঈশ্বর সর্বত্র একই থাকেন, তবে আমরা কিভাবে (তাঁর অস্তিত্বের) সীমানাটি দেখতে পাব?

মানুষের শরীর হিসাবে যা আমরা দেখি, আসলে, বাকি জগতের সঙ্গে বস্তু এবং শক্তি একটি ক্রমাগত বিনিময়। মানুষের শরীরের অংশের এবং বিশ্বের বাকি অংশের প্রতিটি পরমাণুকে পার্থক্য করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাই একইভাবে মানব-শরীরী ঈশ্বরের দেহকে (দেহের পরমাণুকে) পৃথক করা অসম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ, মানব-ইশ্বর থেকে থুতু, প্রস্রাব, ঘাম এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ কি ঐশ্বরিক হবে?

বেদে, ইশ্বরের আকারের কোন ধারণা নেই । এ ছাড়া, এমন কিছু নেই যা ঈশ্বর নিরাকারভাবে করতে পারেন না, যে তাকে অবশ্যই একটি শরীর ধারন করতে হবে ।

প্রশ্ন

এটি কি বোঝায় রাম ও কৃষ্ণ ঈশ্বর নয়?

আমরা সাধারণত দিব্য ঈশ্বরের আকার হিসাবে যা বিবেচনা করি (যেমন রাম ও কৃষ্ণের মতন ব্যাক্তিদের) তারা আসলে ঐশ্বরিক অনুপ্রাণিত ছিলেন । মনে করে দেখ; আমরা ঈশ্বর এর 'ভেতরের ডাক' সম্পর্কে বলেছিলাম। এই কিংবদন্তি নায়করা ছিলেন ঈশ্বর পূজা এবং মনের বিশুদ্ধতার প্রতীক । এবং তাই, সাধারন মানুষের জন্য, তারা স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন । যাইহোক, বেদে, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার কোন ধারণা নেই । সুতরাং, এই ব্যাক্তিগন (ঈশ্বররূপে মানার) পরিবর্তে অনুসরনীয় হওয়া উচিত (অর্থাৎ তাদের উদাহরণ আমাদের নিজের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা উচিৎ) তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। এই নায়ক-অনুসরন পদ্ধতিটি বেদানুকুল এবং আমার বই "সুখী জীবন বিজ্ঞান" এ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

যদি ঈশ্বর আকার গ্রহন করতেন এবং এই আকারের উপাসনা পরিত্রাণের ব্যবস্থাপত্র হতো, তবে বেদে এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকতো । কিন্তু বেদ এ ধরনের ধারণাগুলোর এমনকি ইঙ্গিতও দেয় না ।

প্রশ্ন

এর মানে কি এই সব মন্দিরগুলো এবং রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, লক্ষ্মীর পূজা ভুল?

ধরুন, একটি দূরবর্তী গ্রামে একটি ধার্মিক মা বসবাস করেন । তার ছেলেকে একটি সাপ কামড়েছে। তিনি তার সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য ঝাড় ফুঁকের জন্য স্থানীয় তান্ত্রিকের কাছে যান । আপনি কি তাকে ভুল বা শুদ্ধ বলবেন ?

আজকের এই ঈশ্বর উপাসকদের বিশাল সংখ্যা, সেটা হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান বা যাই হোক না কেন তাদের একই অবস্থা । তাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য । কিন্তু অজ্ঞতা থেকে, তারা ঈশ্বর উপাসনার ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । এটা অবশ্যই বাস্তব সত্য যে, খুব কম ব্যাক্তিই বেদ সম্পর্কে জানে, এমনকি যদিও হিন্দুরা অন্ততঃ স্বীকার করে বেদ প্রধান (ধর্মগ্রন্থ) ।

অতীতের মহান কিংবদন্তিদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার সঠিক উপায় হওয়া উচিত তাদের গুণাবলি আত্মভূত করা এবং সেই অনুযায়ী উন্নতচরিত্রের কাজ করা ।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, ব্যভিচার ইত্যাদি রূপে রাবনদের চারপাশে দেখতে পাই। যদি আমরা এগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে একত্রিত হতে পারি, তাহলে এটাই হবে রামের প্রকৃত গুনকীর্তন করা। একইভাবে কৃষ্ণ, দুর্গা, হনুমান উনাদের ব্যাপারেও।

আমি সারা জীবন ধরে হনুমানজীর একজন ফ্যান হয়েছি। তাঁর গুনকীর্তনের ব্যাপারে আমার পদ্ধতি হয়েছে, আমার নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ এবং সমাজের সেবার জন্য একটি শক্তিশালী এবং সুস্থ শরীর গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহন করা। দুর্বল শরীর এবং অসুস্থ পাকস্থলী নিয়ে ভারী লাড্ডু খাওয়ার সাথে হনুমানজীর উপাসনার কি বিষয় থাকতে পারে!

যদিও এই সমস্ত উপাসনাগুলির পিছনে অভিপ্রায়টি সর্বাধিক শ্রদ্ধার যোগ্য এবং আমরা নম্রভাবে কোন সম্প্রদায়ের কোন ভক্তের প্রকৃত শুদ্ধতাকে সন্মান করি, এটা আমাদের দেখার ইচ্ছা সকল ভক্তরা একইরকম উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যা রাম বা কৃষ্ণ তাদের নিজেদের জীবনে গ্রহন করেছিলেন!

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান?

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। একজন ব্যাক্তির যা ইচ্ছা তা করা হল বিশৃঙ্খলতার এর একটি লক্ষন। অপরদিকে, ঈশ্বর সবচেয়ে সুশৃঙ্খল। সর্বশক্তিমানের অর্থ হল, তাঁর দায়িত্ব পালন করতে ও সৃষ্টি, পরিচালনা, মহাবিশ্বের ধ্বংসের জন্য ঈশ্বরের অন্য কোন সত্ত্বার সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু তিনি কেবল তাঁর দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আরেকটি ঈশ্বর তৈরি করতে নিজেকে হত্যা করবেন না। তিনি নিজেকে নির্বোধ করতে পারেন না। তিনি চুরি বা লুট করতে পারেন না ইত্যাদি।

প্রশ্ন

ঈশ্বরের কি কোনো শুরু আছে?

ঈশ্বরের কোন প্রারম্ভ এবং কোন শেষ নেই। তিনি সবসময় উপস্থিত ছিলেন এবং সবসময় থাকবেন। উপরন্তু, তার বৈশিষ্ট্য সব সময়ে একই থাকে।

আত্মা এবং প্রকৃতি হলো অন্য দুটি শুরুহীন ও শেষহীন সত্তা।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি চান?

ঈশ্বর সব আত্মার জন্য আনন্দ চান এবং তারা যেন যোগ্যতার ভিত্তিতে যথোপযুক্তভাবে যথাযথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সুখ অর্জন করে তা ঈশ্বর চান ।

প্রশ্ন

কেন আমরা ইশ্বরের আরাধনা করি? সর্বোপরি, তিনি কখনও ক্ষমা করেন না !

ঈশ্বর উপাসনা করা উচিত, এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা উচিত। এটি সত্য যে, ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আপনি শর্টকাট পাসের শংসাপত্র পাবেন না যদি আপনি আসলে ব্যর্থ হন । কেবল অলস এবং প্রতারকরাই সফলতার জন্য এই ধরনের অযাচিত উপায় চায় ।

ঈশ্বর পূজার উপকারিতা ভিন্ন হয়ঃ

. ঈশ্বরকে পূজা করার দ্বারা, যে কেউ ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন ।

.উপাসনা দ্বারা, একজন ভালভাবে তাঁর (ঈশ্বরের) বৈশিষ্ট্য বুঝতে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তার জীবনে গ্রহণ করতে পারেন।

.উপাসনা দ্বারা, কেউ 'ভিতরের ডাক' ভালভাবে শুনতে পারে এবং তাঁর (ঈশ্বরের) থেকে অবিরতভাবে পরিষ্কার নির্দেশিকা পেতে পারেন ।

. উপাসনা দ্বারা, যে কেউ অজ্ঞতা দূর করে, শক্তি অর্জন করে এবং আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন।

. পরিশেষে, যে কেউ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতা দূর করতে পারে এবং পরম সুখের সাথে মোক্ষ বা পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে ।

দয়া করে মনে রাখবেন যে উপাসনার অর্থ কিছু একঘেয়ে যান্ত্রিক পাঠ বা চিত্তের শূণ্যতা নয় । এটা কর্ম, জ্ঞান, এবং গভীরচিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান বিকাশের একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি।'

প্রশ্ন

যেহেতু ঈশ্বরের অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় নেই, তাহলে তিনি কীভাবে তাঁর কর্ম পরিচালনা করেন?

যেহেতু এই কর্মগুলো অণুবীক্ষণিক স্তরে ঘটে, তাই তাঁর (ঈশ্বরের) কর্মের জন্য স্থুল (পার্থিব) অঙ্গের প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর সহজাত ক্ষমতার মাধ্যমেই তা করেন। তিনি দেখেন চক্ষু ছাড়াই, কারণ তার চোখ মহাশূণ্যের প্রতিটি স্থানে উপস্থিত থাকে, তাঁর পা নেই, কিন্তু তিনি দ্রুততম, তাঁর কান নেই, কিন্তু সবকিছুই শোনেন, তিনি সবকিছুই জানেন কিন্তু তিনি সকলের সম্পূর্ণ জ্ঞানাতীত । এই শ্লোক উপনিষদ থেকে এসেছে । ঈশোপনিষদ এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি তাঁর সীমা সম্পর্কে জানেন?

ঈশ্বর সবকিছু জানেন। এর মানে যা সত্য তিনি তা জানেন । যেহেতু ঈশ্বর সীমাহীন, তিনি নিজেকে সীমাহীন হিসাবে জানেন । এটা তাঁর জন্য অজ্ঞতার পরিচয়বাহী হবে, যদি তিনি তাঁর সীমাকে জানার চেষ্টা করেন যখন কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিলো না।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি সগুন বা নির্গুন ?

ঈশ্বর সগুন, যদি আপনি ঈশ্বরের দয়াশীলতা, ন্যায় বিচারক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করেন । কিন্তু তিনিই নির্গুন যখন আপনি উল্লেখ করেন যে, মুর্খতা, জ্ঞানহীনতা, ক্রোধ, প্রতারণা, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির অধিকারী তিনি নন। এটি শুধুমাত্র একটি শব্দার্থগত পার্থক্য।

প্রশ্ন

কিছু পণ্ডিতরা বলছেন যে ঈশ্বর কর্ম করেন না এবং তার কোনও সম্পত্তি নেই। যা ঘটছে তিনি শুধুমাত্র তার সাক্ষী হন এবং তাঁর পরিকল্পনা করা আইনের মাধ্যমে জগত পরিচালিত হচ্ছে।

ঈশ্বর সবচেয়ে গতিশীল সত্তা । এবং তার সম্পত্তি অসীম । যাইহোক, তার সক্রিয়তা এটা বোঝায় না যে তিনি নিজে পরিবর্তন করেন, কিন্তু তিনি সব কর্মের উৎস।

আইন হিসাবে আমরা যা বলছি তা হলো আসলে ঈশ্বর খুব নিখুঁত পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদন করছেন । এগুলো এতই নিখুঁত যে, আমরা প্রতিবার তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে দেখতে পাই । তাই একই সাথে তার কিছু কর্মকে, গাণিতিক সমীকরণগুলিতেও রূপান্তর করা যায়। এবং আমাদের দ্বারা প্রতীয়মান একটি পুনরাবৃত্তিমূলক নিখুঁত ব্যাখ্যাহীন ঘটনাটি

আমাদের দ্বারা 'আইন' হিসাবে বলা হয়, কারণ কীভাবে এটা ঘটতে পারে তার পিছনের কারনটি আমরা জানতে পারি না।

ঠিক যেন একটি বধির-অন্ধ শিশুকে নিয়মিতভাবে মা শৈশব থেকে খাইয়ে আসছেন যখনই সে কান্না করে । এবং তারপর শিশুটি দাবি করে যে এটি একটি 'আইন' যে, সে কাঁদলেই খাদ্য পায় !

যতক্ষন একটি কারণ থাকবে না, এর কোন প্রভাব হবে না । এবং ঈশ্বর চূড়ান্ত কারণ । দেখি শ্বেতশক্তার উপনিষদ ৬/৮ কি বলেঃ

বাহ্যিক সমর্থন ছাড়া ঈশ্বর তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন । কেউই তার সাথে তুলনীয় নয় বা তার তুলনায় ভাল নয় । তিনি প্রধান, তার অসীম শক্তি ও অসীম সক্রিয়তার সাথে । ঈশ্বর যদি সক্রিয় না হতেন তবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা ও ধ্বংস করা অসম্ভব হয়ে যেত।

তিনি প্রাণবন্ত, সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং সর্বাধিক সক্রিয়।

তিনি যখন কাজ করেন, তখন তিনি কোনও নির্দিষ্ট কাজের জন্য সময় এবং স্থানের উপর নির্ভর করে একটি নিঁখুত পদ্ধতিতে কাজ করেন, যেটা অতিরিক্তও নয় আবার কমও নয় । সর্বোপরি, তিনি সবচেয়ে নিখুঁত !

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি অবতার ?

ঈশ্বর অবতীর্ণ হন না কারণ বেদ স্পষ্টতই তাকে জন্মহীন, নিরাকার এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে । অপরদিকে, বেদ বলে যে তিনি সকল সময়ে তাঁর অপরিবর্তনীয় পরিচয় বজায় রেখে সব কর্তব্য পালন করতে পারেন।

যর্জুবেদ ৩৪/৫৩

তিনি জন্মহীন এবং সর্বদা এক ও একক সত্তা বজায় রাখেন ।

যজুর্বেদ ৪০/৮

তিনি সর্বদা সমান, শরীরহীন, স্নায়ুবিহীন, ফাঁকহীন (নিঁখুত) এবং অপরিবর্তনীয়।

প্রশ্ন

শ্রী কৃষ্ণের ন্যায় অবতারগন তাহলে কি? তিনি স্পষ্টতই গীতার ৪/৭ এ দাবি করেন যে যখনই ধর্মের (গুনসমূহ) পতন এবং অধর্মের (মন্দের) উত্থান ঘটে, আমি এই পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হই।

বেদে এই ধরনের কোন মন্ত্র নেই যেটা বলে যে 'ঈশ্বর জন্মগ্রহন গ্রহণ করে' । যেহেতু বেদই সর্বোচ্চ প্রমাণ; গীতা অবশ্যই বৈদিক লাইনেই ব্যাখ্যা করতে হবে ।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একজন মহান যোগী। ধর্মের সুরক্ষা এবং অধর্মের ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা এটা মহান লোকেদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা।

নিঃস্বার্থতা মহান মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য । তাই, ধর্মের সেবা করার জন্য শ্রী কৃষ্ণ বার বার জন্ম নিতে চেয়েছিলেন । আমরা শ্রী কৃষ্ণের এই মহান চিন্তার প্রতি নম্র, এবং সেই কারণেই তিনি আমাদের নায়ক ।

প্রশ্ন

কিন্তু ঈশ্বরকে রাবণ এবং কংসের মত মন্দ মানুষকে ধ্বংস করতে দেহগ্রহণ করতে হবে ।

মন্দ লোকদের ধ্বংস করতে অবতার হওয়াটা ঈশ্বরের জন্য খুব ছোট একটি বিষয় যার জন্য তাঁর বৈদিক রীতিনীতিকে ভাঙতে হয় এবং জন্ম গ্রহণ করতে হয় । তিনি যেহেতু সৃষ্টি করতে পারেন, পালন করতে পারেন, সমগ্র মহাবিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন এবং প্রতিটি আত্মার কর্ম-চক্র পরিচালনা করতে পারেন, কেন তিনি এই ধরনের ছোট কাজের জন্য জন্ম গ্রহণ করবেন? সর্বোপরি, তিনি রাবণ ও কংসের দেহেও আছেন এবং তাদের প্রত্যেকটি কর্ম পরিচালনা করেন । তিনি সহজেই তাদের ধ্বংস করতে পারেন যখনই তাঁর মনে হবে এটাই সঠিক সুযোগ ।

প্রশ্ন

সঠিক উদাহরণ স্থাপন করতে তাঁর জন্ম নেয়া প্রয়োজন ।

"সঠিক উদাহরণ স্থাপন করার জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই জন্ম দিতে হবে", এটিও ভুল কারণ তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে যথাযথভাবে বজায় রাখার মাধ্যমে বড় উদাহরণ স্থাপন করছেন । সমগ্র মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার চেয়ে বড় উদাহরণ কি হতে পারে ! ভক্তরা নিজেই এর মাধ্যমে তাঁর মহিমা বুঝতে পারবে।

তিনি আমাদেরকে 'ভিতরের কন্ঠস্বর' দ্বারা সকল দিক দিয়ে পরিচালিত করেন এবং ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত আদর্শ ব্যাক্তিগন দ্বারা (পরিচালিত করেন) যার কর্মকান্ডসমূহ আমাদের আরও অনুপ্রেরণা দান করে ।

উপরন্তু, ঈশ্বর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, আনন্দ, অজ্ঞতা, মরণশীল কর্ম, কর্মের ফলাফল, জীবন এবং মৃত্যুর সীমাবদ্ধতার বাইরে। যদি আপনি অবতারদের গল্পগুলি পড়েন, তবে আপনি অবতারগনের কাহিনীগুলো পড়েন আপনি খুঁজে পাবেন এই বর্ণিত অবতারগন এই প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যেটা কেবলমাত্র আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারে ঈশ্বরকে না। আরো বলা যায় যে ঈশ্বর এই মরণশীল বৈশিষ্ট্যের অধীন হয়ে পড়েছেন এটা সকল দিক দিয়ে নিখুঁত ঈশ্বরের অপমান।

প্রশ্ন

আমি যদি বলি ঈশ্বর এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন না, তবে মানবতা প্রদর্শন করার জন্য কেবল এইগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ভান করেন?

এটি আবার ঈশ্বরের একটি অপমান, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং সত্য। তিনি একটি নাট্য শিল্পী নন। তিনি কখনো অভিনয় করেন না। তিনি শুধুমাত্র যা সত্য তাই কেবল করেন। তিনি মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে আমাদের নেতৃত্ব দেন।

এছাড়াও, যদি আমরা বিবেচনা করি যে রাম বা কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, তবে তারা তাদের জীবনযাত্রায় যা অর্জন করেছেন তাতে মহান কিছু নেই। ঈশ্বর, যিনি সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা এবং ধ্বংস করতে পারেন, একটি ছোট গ্রহের কিছু ক্ষুদ্র মানুষকে হত্যা করাছেন, এবং সেটাও করেছেন আবার প্রচুর যন্ত্রণা এবং ব্যর্থতা সয়ে, এটি প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষমতার ব্যাপারে একটি উপহাসমাত্র হয়।

প্রশ্ন

তাহলে রাম এবং কৃষ্ণ কে?

রাম এবং কৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত মহানায়ক। তারা যা অর্জন করেছেন তা ছিলো আশ্চর্যজনক এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তারা আমাদের নিজেদের জীবন ও চরিত্রকে ঈশ্বরের সত্য উপাসকদের অনুসরিত পথে গঠন করার পরিমাপক (হিসেবে কাজ করেন)।

প্রশ্ন

কিন্তু অবতার ধারণায় বিশ্বাসী হলে ভুলটা কি?

অবতারদের গল্পের কোন স্থান বেদে নেই। অবতারবাদের ধারণা একটি সাম্প্রতিকতম একটি ধারনা। এবং যখন থেকে এই ধারণাটি উত্থাপিত হয়েছে, আমরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছি। সমগ্র পৃথিবীর শাসক থেকে, আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে এমন

একটি স্তরে নিয়ে এসেছি যেখানে আমাদের নিজেদের দেশেই নিজেদের যথাযথ অধিকার নেই।

এটা দুঃখের বিষয় যে আমরা ঈশ্বরের কাল্পনিক অবতারদের উপাসনায় কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে থাকি, এটা একটা ভুল উপায়। কিন্তু আমরা যাঁদের অবতার হিসেবে পূজা করি, সেই মহান পুরুষের সঠিক উদাহরণ অনুসরণ করে ঈশ্বরের সত্য উপাসনা করার জন্য সম্পদ ও শক্তিকে একত্রিত করি না । এ কারণেই আমাদের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় সত্ত্বেও, পরমেশ্বরের জন্য প্রকৃত ভালবাসা সত্ত্বেও, আমাদের আছে জন্মভিত্তিক বর্ণবাদের মত অর্থহীন বিষয় এবং লিঙ্গ বৈষম্য, ধর্মান্ধ মতবাদীদের আক্রমন, খ্রিস্টীয়করণ, দুর্নীতি, অনৈতিকতা ইত্যাদি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এগুলো লড়াই করে দূর করার পরিবর্তে, আমরা ঈশ্বরের উপহার আমাদের শক্তি, সক্ষমতাকে নষ্ট করি অনুৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপে।

প্রশ্ন

তাহলে রাম, কৃষ্ণ, হনুমানজীকে সত্যিকারের সম্মান কিভাবে করা হবে?

রাম, কৃষ্ণ, হনুমান প্রভৃতির প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধাটা, তাদের বড় বা ছোট ঈশ্বররূপে বিবেচনা করে এবং তাদের উপর জল, ফুল, দুধ ঢেলে এবং গানের দ্বারা তাদেরকে ঈশ্বররূপে জয়ধ্বনী দিয়ে স্তব করে, হবে না। বরং তারা যা করেছিলেন তা অনুসরন করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে। তাঁদের অনুসরনে আমাদের দেহকে শক্তিশালী করে, ব্যায়ামের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করে, ধ্যান, নিয়মানুবর্তি রুটিন, উচ্চতর চরিত্র, জ্ঞান বৃদ্ধি করে, সত্য ধর্ম বা বেদ বুঝে, চারপাশের রাবন ও কংসের সাথে যুদ্ধ করে, সকল দিকে মাতৃশক্তির সম্মান রক্ষা করে এবং সত্যিকারের রামরাজ্য স্থাপন করে (রাম, কৃষ্ণ, হনুমানজীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে)।

এটাই ঈশ্বরের সত্যিকারের উপাসনা, এবং এর কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

সেই সংগঠন এবং গোষ্ঠী যারা উচ্চস্বরে অবতারবাদকে রক্ষার জন্য কাজ করেন তাদের প্রতি আমাদের বিনম্র অনুরোধঃ

. মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক করে তাদের কনভেনশন এজেন্ডা মোকাবেলা করতে সঠিক উদাহরণ স্থাপন করুন।

. ধর্ম রক্ষার জন্য দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোটি কোটি ডলার মন্দিরসমূহে ব্যায় করুন।

. তথাকথিত দলিত ও অস্পৃশ্যদের তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করুন।

. ব্যাপক শুদ্ধি কর্মসূচী পরিচালনা করুন এবং তারপর রাম ও কৃষ্ণের প্রকৃত উদাহরণ অনুসরণ করুন।

আদি শঙ্করাচার্য তাঁর পরা-পুজায় লিখেছেনঃ "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কীভাবে আমরা আহ্বান বা বিসর্জন দিতে পারি? আসন কিসের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে যিনি আমাদের সবাইকে ইতিমধ্যেই ধারন করে আছেন? ঈশ্বরের পা ও মুখ ধোয়ার জন্য জলের কাজ কি, যেখানে তিনি সবচেয়ে পবিত্র? কিভাবে আমরা তাকে স্নান করতে পারি? সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর মধ্যে আছে। কিভাবে আমরা তাঁর উপর কাপড় পড়াতে পারি? কিভাবে আমরা তাঁর উপর জানু বা যজ্ঞোপবীত (পবিত্র সুতা) রাখতে পারি? যেখানে তিনি সকল বর্ণ বিভাগকে ছাপিয়ে যান। কিভাবে আমরা সেই একক সত্তার মূর্তির উপাসনা করতে পারি ? যিনি নিরবিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এক ও অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজিত?

প্রশ্ন

তাই অবতার হওয়ার পরিবর্তে, ঈশ্বর নবীদের পাঠান, ঠিক?

ঈশ্বর নবীদের পাঠান এই ধারণাটি সবচেয়ে অর্থহীন ধারণা। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমরা মনে করে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান একই সাথে নবীকেও বিশ্বাস করেন। এভাবে, তারা বুঝায় যে আল্লাহ্ সরাসরি জীবদেরকে পরিচালনা করতে যথেষ্ট সক্ষম নন এবং তাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য নবী এবং দেবদূতদের মত এজেন্ট ব্যবহার করতে হয়।

এবং ঈশ্বরের ক্রটিপূর্ণ দিকগুলোর দিকে খেয়াল করুন যখন তিনি নবীদের দ্বারা কাজ করেন। যীশু একজন নবী হতে পারেন, এবং তিনি যথাযথভাবে বাইবেল নথিভুক্ত করতে পারেন নি। যাই তিনি করেন না কেন ব্যর্থ হয়েছেন কারণ প্রকৃত বাইবেল এখন আর বিদ্যমান নেই। একইভাবে, মুহাম্মদকে আল্লাহ র নবী বলা হয় কিন্তু তার জীবনকালের সময় কোরআন সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করতে পারলেন না। তিনি এমনকি জানতেনও না তাঁর বইকে কুরআন বলা হবে। কুরআন পরবর্তীতে তার মৃত্যুর ২০ বছর পর বিতর্কিত উপায়ে সংকলন করা হয়। বর্তমানে কুরআনের যে প্রাচীন কপিটি সচরাচর পাওয়া যায় সেটি মুহাম্মদের মৃত্যুর ৩০০ বছর পরের এবং এটি তার মৃত্যুর ২০ বছর পর সংকলিত কুরআনের একটি কপি বলে মনে করা হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত সম্প্রদায় যারা নবী-রাসুলে বিশ্বাস করে তাদের এই হলো পথ।

কিন্তু বৈদিক ঈশ্বর সত্যিই সর্বশক্তিমান এবং তাই এজেন্টদের ব্যবহার করার পরিবর্তে তিনি সকল আত্মার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন। তিনি মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সময়ে বেদ প্রকাশ করেন এবং তারপর ক্রমাগত সব জীবিত সত্তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কঠোর উপায়ে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদকে নিরাপদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন

। আর অধিকন্তু তাঁর 'ভেতরের কণ্ঠস্বরের' মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করেন যে, এমনকি আমরা যদি বেদ ব্যবহার নাও করতে পারি, আমরা তখনও তাঁর দ্বারা পরিপোষিত হব এবং পরিচালিত হব ঠিক যেভাবে একজন মা সন্তানকে দেখভাল করেন।

বৈদিক ঈশ্বর আমাদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে। তাই আমাদের নির্দেশনা পেতে তৃতীয় পক্ষের আউটসোর্সিং এজেন্টের কোন দরকার নেই। আমাদের তাই কেবলমাত্র এই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, যত্নশীল এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করা উচিত। সমস্ত নবী মিথ্যা এবং (এই মতবাদ) ঈশ্বরের মহিমার গুরুতর অবমাননা। অতএব, যাদের মনে ঈশ্বর / আল্লাহর জন্য কোন সম্মানবোধ আছে তাদের অবিলম্বে (এই মতবাদ) প্রত্যাখ্যাত করা উচিত।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি তাঁর ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন না?

ঈশ্বর শুধুমাত্র ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করেন। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ উপাসক হওয়ার দ্বারা, আমাদের মন শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য, ভবিষ্যতে আমাদের দ্বারা কৃত পাপ কাজ ক্ষীন থেকে ক্ষীনতর হয়। ঈশ্বর এই শুদ্ধি প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করেন।

কিন্তু অতীতের পাপ কখনো ক্ষমা করা হয় না। আমাদের প্রতিটি কাজ সেটা ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন, অবশ্যই যথাযথ ফলাফল প্রদান করে। কোন রেকর্ডই মুছে ফেলা হয় না।

যাইহোক, ফলাফলগুলি হল এমন যে কেবলমাত্র আমাদের সর্বোত্তম সুফলের জন্য তাদের অভিপ্রায় অর্থাৎ আমাদেরকে পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর করানো। এটা হয় তাঁর (ঈশ্বরের) নিঃশর্ত দয়াশীলতার কারণে।

এইভাবে, মানুষ, যারা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে, উপবাস করে, তীর্থযাত্রা করে, স্নান করে তাদের অতীতের রেকর্ড মুছে ফেলার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে এবং নিজেদের বোকা বানায়। এইভাবে আপনি দেখবেন যে প্রতারক রাজনীতিবিদ, অভিনেতা এরা ঈশ্বরের নিকট এককাঠি বেশি 'ঘনিষ্ঠ'। এইভাবে অশ্লীল সিনেমাগুলি দেবতাদের / পূজার স্থানের বা ধর্মীয় শ্লোকের মাধ্যমে শুরু হয়। এ ধরনের মানুষ ব্যাপক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং তাদেরকে মন্দির, দরগা, মসজিদগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। এটি শুধুমাত্র প্রচারের কৌশল হিসাবে কাজ করে না, অধিকন্তু এটি তারা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য করে থাকে যাতে নিয়মিত ভিত্তিতে তারা যে ঘৃন্য পাপ করেছে তা যেন মুছে যায়।

কিন্তু ঠিক যেমন স্থূলতা কেবলমাত্র একটি পিল খেলে দূর হয় না বা 'দুঃখিত,' শব্দটা বললেই পাপের প্রবণতা তাৎক্ষণিকভাবে মুছে যায় না । এটা নিয়মিত প্রচেষ্টার দাবি রাখে এবং সেই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে, প্রতিটা সংঘটিত পাপ হিসাব করা হবে কোন রকম মুছে ফেলা বা হিসাবের সমতা আনয়ন ছাড়া ।

বাস্তবে, ঈশ্বর ন্যায় বিচার করার জন্য অপেক্ষা করেন না । যে মুহূর্তে আমরা কোন ভালো বা খারাপ কর্ম করি, তিনি আমাদেরকে ফলাফল দিতে শুরু করেন । যাইহোক, এই ফলাফলের বাস্তব প্রভাব অবিলম্বে বা কিছুসময় পর আমাদের কর্ম এবং আমাদের বুঝতে পারার ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের দ্বারা পরিলক্ষিত হয় । যখন ফলাফল অনুধাবন করতে বিলম্ব হয়, তখন আমরা এটিকে অতীতের কর্মফল হিসাবে অভিহিত করি । কিন্তু বাস্তবে, এই প্রক্রিয়াটি অবিরতভাবে ঘটে চলছিলো ঠিক যে মুহুর্ত থেকে আমরা কাজটি করেছিলাম তখন থেকেই । এটা অনেকটা ডায়াবেটিসের মত যেটা অবিরত ঘটতে থাকে, আমাদের গ্রহন করা প্রতিটি খাদ্যের মাধ্যমে বা আমরা ব্যায়াম করেছি বা করিনি (তার মাধ্যমে) বা আমরা কোন চাপ নিয়েছি বা নেইনি (তার মাধ্যমে) । তবে তার প্রভাব হয়তোবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেই প্রকাশ হতে পারে।

এছাড়াও, ঈশ্বর যদি পাপের অতীতের রেকর্ডগুলিকে মুছে ফেলতেন, তবে তিনি আর ন্যায় বিচারক থাকতে পারবেন না কারণ সবারই প্রবণতা থাকবে এই মুহুর্তে অপরাধ করার এবং তারপর পরবর্তীতে 'দুঃখিত' বলবে পূর্বে উল্লেখিত প্রতারক লোকেদের মতন । এবং যদি ঈশ্বর তাদের কথা শুনেন, তবে তাদের এই নির্বুদ্ধিতা কেবল আরও আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরনা পাবে । এমনকী যারা পাপ করে না তারাও পাপ কাজের প্রেরণা পাবে । অতএব, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু উভয়ই, যেটা নিশ্চিত করে যে আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম কমও নয় বা বেশিও নয় একদম যথাযথ ফল প্রদান করে কারণে শুধুমাত্র আমাদের উপকারের জন্য ।

অতএব, সে সকল দলীয় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা যারা তাদের নবীকে স্বীকার করার মাধ্যমে পাপের ক্ষমা লাভের লোভ দেখিয়ে লোকেদেরকে আকৃষ্ট করে, তারা ঈশ্বরকে অপমান করে এবং নিজেদেরকেও বোকা বানায়। সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অবিলম্বে তাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

প্রশ্ন

আমরা শুনেছি যে ঈশ্বর জানেন, অতীতে যা ঘটেছে, যা এখন ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে । সুতরাং, যাহাই তিনি জানেন, আত্মাকে সে অনুসারে কাজ করতে হয় । অতএব,

আত্মা কর্মে স্বাধীন নয় এবং নিছক একটি পুতুল মাত্র। তবুও, আত্মাকে ঈশ্বর অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করে।

এই অভিযোগগুলি ঐসব দলবর্গের পক্ষে সত্য, যারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর পূর্বেই প্রত্যেকের নিয়তি লিপিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জাল কুরআন ও হাদীসগুলির উপর ভিত্তি করে অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ইতোমধ্যেই লোহে মেহফুজে প্রতিটি ভবিষ্যতের ঘটনা সংকলন করেছেন এবং এটি তার সিংহাসনের নিচে রেখেছেন। তারা এভাবে আল্লাহকে একজন মনোবৈজ্ঞানিক স্বৈরশাসক বানিয়েছে যিনি আত্মার সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তাঁর খেয়াল অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেছেন। তিনি কিছু আত্মাকে শাস্তি দেন, অন্যদেরকে পাপ করতে লোভ দেখান এবং বেপরোয়াভাবে অন্য আত্মাদের পক্ষাবলম্বন করেন। যদি এমন একটি বই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকে তবে তা কেবল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপমান হতো।

এ ছাড়াও, যেহেতু আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, তবে কেন একটি বই (লোহে মেহফুজ) তৈরি করার দরকার হলো যেটা তিনি কেবল পড়তে পারেন? তিনি কি ভয় পাচ্ছেন যে তাঁর স্মরনশক্তি হারিয়ে যেতে পারে?এছাড়াও (আরো প্রশ্ন) ওই বইয়েও (অর্থাৎ লওহে মাহফুজেও) কি লেখা আছে যে আল্লাহ্ লওহে মাহফুজ বইটি লিখবেন ? এই ধরনের তত্ব হলো শিশুসুলভ এবং স্পষ্ট গোজামিলে পূর্ণ।

কিন্তু এই ধরনের কল্পনাগুলি বৈদিক ঈশ্বরের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। অতীত বোঝায় কিছু ছিলো কিন্তু এখন আর বিদ্যমান নেই। ভবিষ্যত বোঝায় এখন বিদ্যমান নয়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান সবসময় একই এবং অভিন্ন ও সত্য। অন্য কথায়, যে জিনিসগুলির অস্তিত্ব নেই তা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের এক্তিয়ারে বা সীমানায় পড়ে না।

ভবিষ্যত এবং অতীত কেবলমাত্র (জীবের) আত্মার জন্য, ইশ্বরের জন্য নয়, যিনি এই ধরনের সময়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে। কেউ বলতে পারেন যে জীবাত্মার কর্মের ব্যাপারে ঈশ্বর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত জানেন, কিন্তু সহজাতভাবে তিনি সময়ের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। অন্য কথায়, ঈশ্বর জানেন, একটি আত্মা (জীবাত্মা) কি করে এবং কী ফল তাকে সঠিকভাবে দিতে হবে। কিন্তু ইশ্বরকে ইতিহাসের কথা জানতে অতীতের দিকে তাকাতে হয় না, কিংবা কী ঘটবে তা আবিষ্কার করতে ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হয় না। তিনি সর্বদা বর্তমান এবং সকল সময়ে সত্য স্বাধীন জ্ঞানের অধিকারী (জীবের) কর্মসমূহে ও ফল প্রদান উভয় ক্ষেত্রে।

বর্তমানে কর্ম করার ব্যাপারে আত্মা কিছুটা স্বাধীন (এর অতীত কর্মের ফলস্বরূপ এই জন্মে প্রাপ্ত সংস্কার বা প্রবৃত্তি সাপেক্ষে) কিন্তু এই সমস্ত কর্মের ফলাফলের জন্য সম্পূর্ণভাবে

ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল । এখন ঈশ্বর নিশ্চিত করছেন যে এই (কর্মের) ফলাফলগুলি এমনই যে আত্মার এই সংস্কারগুলো (যেগুলো কর্মফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়) বিশেষায়িত করা হয়েছে আত্মাকে সহায়তা করতে যাতে সেই আত্মা তার সীমিত স্বাধীনতাকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারে স্বাধীন ইচ্ছার সীমাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে এবং পরমসুখ অর্জন করতে পারে সবচেয়ে সন্তোষজনক উপায়ে। এইটি প্রতিটি মুহুর্তে একটি চলমান প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকে।

যোগের সমগ্র ক্ষেত্রটি আমাদের সর্বোত্তম কল্যানের জন্য ঈশ্বরের এই বিধানকে যুক্ত করার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে ।

প্রশ্ন

আত্মাও কি ঈশ্বর এবং মোক্ষলাভের পরে ঈশ্বর হয়ে যায় ? যদি তা না হয় তাহলে অদ্বৈত কি ?

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে আত্মার প্রকৃতি অধ্যয়ন করব । কিন্তু সংক্ষেপে উত্তর দিতে গেলে, আত্মা ঈশ্বর নয় । আত্মা যদি ঈশ্বর হয়, তাহলে এটি ইতিমধ্যেই ঈশ্বর । কেন তবে আমরা এখন সমগ্র মহাবিশ্ব পরিচালনা করতে অক্ষম এবং এক আত্মা (ঈশ্বর) অন্য এক আত্মার (ঈশ্বর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যখন তারা এক এবং একই ? যদি আপনি মায়া বা অজ্ঞতার কারণ বলে থাকেন তবে এর মানে হল যে ঈশ্বরও অজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত । এখন এইটি বেদ বিরুদ্ধ, বেদে পরিষ্কারভাবে বলছে যে ঈশ্বর অজ্ঞতা সীমাবদ্ধতার অতীত এবং সবসময় তাই থাকেন ।

এছাড়াও, যদি আমি ঈশ্বর হই এবং বুঝতে না পারি যে আমি ঈশ্বর, তাহলে এই মুহুর্তে মহাবিশ্বের পরিচালনা করছেন কে ? যদি আপনি বলে থাকেন যে আমি মহাসমুদ্রে এক ফোঁটা জল যেমন, তেমনি বিশাল 'প্রধান ঈশ্বর বা ব্রহ্ম' যিনি জগত পরিচালনা করছেন তাঁর এক ক্ষুদ্র অংশ, তাহলেও (প্রশ্ন থাকে) নিশ্চয়তা কী হবে যে, 'প্রধান ঈশ্বরও' অজ্ঞতা ও পাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না এবং এভাবে মহাবিশ্বকে পরিচালনা করছেন ভুলভাবে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত পদ্ধতিতে ? সর্বোপরি, (হাস্যকর) এটাই যে ঈশ্বর আমাতেও আছেন, আমিও ঈশ্বর এবং আমি জানি আমি এখন অজ্ঞ !

এই সকল কিছু কল্পিত যুক্তিতে পরিনত হবে যেটা হয়তো কবিতা এবং উদ্ধৃতিতে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু যুক্তিপূর্ণভাবে নিরাপদ, এভাবে অভিহিত যাবে না।

আত্মা ঈশ্বর হন বেদে কোথাও এ ধরনের ধারনা নেই বরং এর পরিবর্তে স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে আত্মা ও ঈশ্বর আলাদা আলাদা ।

অদ্বৈত মতবাদটি এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের বৈদিক ধারণাকে বোঝায় । এর মানে হল যে শুধুমাত্র এক ঈশ্বর আছে এবং আর নেই । তিনিই শুধুমাত্র উপাস্য ।

প্রশ্ন

যদি এমন হয় তাহলে শঙ্করাচার্য আত্মা এবং ঈশ্বর একইরকম কথা কেন বলেছেন ?

শঙ্করাচার্য একজন বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন যিনি এমন একটি যুগে বসবাস করতেন যেখানে নিরীশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল । তিনি যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরীশ্বরবাদের বিরোধীতা করতেন, নাস্তিকতার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে এমন যেকোন কিছুর (বিরোধীতা করতেন), এমনকি আত্মাকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে বিবেচনা করে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমান করতে পারতেন। যদি তিনি এমনটা না করতেন, আমরা বৈদিক জ্ঞানকে রক্ষা করতে সক্ষম হতাম না। এই মহান কাজের জন্য তাঁর প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ।

যখন শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন, বেদ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করার ঐতিহ্য ইতিমধ্যে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল । বেদ শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার পালনের পুস্তকরূপে বিবেচনা করা হচ্ছিলো । এভাবে, এমনকি শঙ্করাচার্যও বেদ নির্ভর থাকেননি এবং বেদান্ত, গীতা ও উপনিষদগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, যা সেই সময়কালে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল । এইভাবে তিনি এই মহান বইগুলির উপর তার যুক্তিতর্কগুলোর ভিত্তি করতেন এবং নিরীশ্বরবাদের বিরোধীতা করতেন । তিনি ন্যায়দর্শনের নিয়মানুসারে এটি করতেন, যেটি স্বল্পমেয়াদে একটি অধিকতর বিপজ্জনক রীতিকে মোকাবেলার জন্য 'বিতন্ডা' বা অপেক্ষাকৃত উত্তম যুক্তি প্রদানকে স্বীকার করে । যাহোক লক্ষ্য করুন এই 'বিতন্ডার' ক্ষেত্রটি কেবল যুক্তি বিচারেই সীমাবদ্ধ এবং তাদের মধ্যে বাস্তবতা নেই।

এখানে বিতন্ডার একটি উদাহরণঃ

প্রাথমিক রীতিঃ

সকল ধর্মত্যাগকারী যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রচার করে তাদেরকে হত্যা করা উচিত - জাকির নায়েক।

বিতন্ডা যুক্তিঃ

একজন ধর্মত্যাগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, বাকি জনসংখ্যা তার মতবাদকে (অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী মতবাদকে) প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ইসলাম প্রচার করছে । অতএব, তাকে নয় বরং ইসলাম প্রচারকারীদেরকেই হত্যা করা উচিত ।

প্রাথমিক রীতিঃ

কিন্তু এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। অতএব, রাষ্ট্রের বাকী লোকদের নয়, ধর্মত্যাগী ব্যাক্তিটিই রাষ্ট্র বিরোধী তাকে হত্যা করা উচিত। - জাকির নায়েক।

বিতন্ডা যুক্তিঃ

এই যুক্তি দ্বারা, মুহাম্মদকে হত্যা করা আবশ্যক, যখন তিনি প্রথম ইসলাম প্রচার করেছিলেন। কারণ একমাত্র তিনি ছিলেন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত ও সমগ্র রাষ্ট্র ইসলামে বিশ্বাস করেনি।

উল্লেখ্য যে আমরা বলতে চাই না যে সমস্ত মানুষকে হত্যা করা উচিত বা মুহাম্মদকে হত্যা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা এই বিতর্কগুলো ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র একটি অদ্ভুত যুক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য যা বহুসংখ্যক জ্ঞানহীন লোকেদের মধ্যে প্রচলিত।

অদ্বৈত যুক্তিতর্কের বেলায়ও এমনটাই ঘটেছে। শঙ্করাচার্য ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিরীশ্বরবাদের বিরোধীতার জন্য এইগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এবং তিনি বেদ বিরোধী সকল নিরীশ্বরবাদী মতাদর্শকে পরাজিত করার পর কিন্তু তাঁর প্রখর মেধা থেকে আরও বেশি কিছু দান করার আগেই অত্যন্ত অল্প বয়সে ৩২ বছর বয়সে মারা যান। তাই আমরা তাঁকে ভুলভাবে আত্মা = ঈশ্বর এই মতবাদে বিশ্বাসী বলে বিবেচনা করি।

প্রকৃতপক্ষে, বেদান্ত, উপনিষদ এবং গীতা থেকে তাঁর মন্তব্যগুলিতে বিপুল সংখ্যক এমন শ্লোক আছে যেটা ইঙ্গিত দেয় তিনি ইশ্বর এবং আত্মা আলাদা এই তত্বে বিশ্বাসী।

বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক সত্ত্বেও, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে অদ্ভুত কাজ করতে পেরেছিলেন তা কল্পনা করুন! গুরুকুল শিক্ষার মূল বিষয়গুলো অর্জন করতেই কমপক্ষে ২৫ বছর সময় লাগে। এবং ৩২ বছর বয়সে, আমাদের একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি আমাদের দেশ ও পৃথিবীর ভবিষ্যত বদলে দিয়েছেন! আসুন আমরা সকলে তাঁর মহান প্রতিভাকে নম্রভাবে সন্মান জানাই এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর যেন আমাদের সকলকে একই রকম মেধা দান করেন।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি রাগি (আবেগ এবং অনুভুতি পূর্ণ) বা বিরক্ত (ক্রোধ প্রকাশকারী) ?

ঈশ্বর এসবের মধ্যে নেই। ঈশ্বর এই ধরনের প্রবণতার বাইরে কারণ আবেগ এমন জিনিসগুলির জন্য হয় যেগুলো আগে থেকেই আমাদের অংশ নয় এবং 'অধিকার বর্জন' সে সকল জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে হয় যেগুলো আমরা যা পূর্বে অর্জন করেছি। কিন্তু যা কিছু দরকার ঈশ্বর এমনিতেই তার অধিকারী এবং কোন কিছুকে ত্যাগ করতে হয় না কারন তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান।

প্রশ্ন

ঈশ্বরের কি কোন কিছুর আকাঙ্খা আছে ?

ঈশ্বরের কোন ধরনের আকাঙ্খা নেই যেমনটা আত্মার মধ্যে আমরা দেখতে পাই । আত্মা সে সকল কিছুর জন্য আকাঙ্খা করে যা সে অর্জন করতে পারেনি । তাই সকল কিছুর অধিকারী কিভাবে কোন কিছুর আকাঙ্খা করতে পারে ? এবং পরমানন্দময় হয়ে, তাঁর এমনকি সুখ কামনা করারও প্রয়োজন নেই । যাইহোক, তিনি আত্মাকে সুখ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংসের প্রেরণা যোগান । এটিকে ঈশ্বরের 'ইক্ষন' বা তার কর্মের উদ্দেশ্যপূর্ণতা হিসেবে অভিহিত করা হয় ।

যারা মনে করেন যে ঈশ্বর আত্মার দ্বারা উপাসনা কামনা করে থাকেন তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে আত্মতোষক, প্রশংসা লোভী স্বৈরশাসক বলে মনে করে অপমান করছে । আমরা যাহাই উপাসনা করি, তা করি নিজেদের উন্নত করতে এবং তাহা ঈশ্বরকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করে না ।

{২}

উপাসনার ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

উপাসনার বৈদিক পদ্ধতি কোনটি ?

বেদ ঈশ্বরকে মানুষের মত বিবেচনা করে না । এটি ঈশ্বরের প্রথাগত উপাসনায়ও বিশ্বাস করে না । বিপরীতে, এটি যোগ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের পূজা করার শিক্ষা দেয় যেটা আত্মা, মন এবং দেহের জন্য একটি টনিক হিসাবে কাজ করে । যোগ পদ্ধতিকে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় 'আসন' এবং 'প্রানায়ামের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে বিভ্রান্তিতে পড়া যাবে না ।

অপরদিকে, যোগ পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যাহা ব্যাক্তিকে ঐশী বিধানের সাথে একাত্মতা আনে যে বিধান এই সৃষ্টিকে চালিত করছে এবং এভাবে ব্যাক্তির আনন্দ ও মনের শক্তিকে বহুগুনে বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন

ঠিক আছে। কিন্তু আগে আপনি বলেছেন যে ঈশ্বর অলঙ্ঘ্যনীয় বিধান অনুযায়ী কাজ করেন। তাহলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কিভাবে সহায়তা করবে যদি ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর অলঙ্ঘ্যনীয় বিধান অনুসারেই কাজ করেন ?

ঈশ্বর বিশেষ ডিসকাউন্টের প্রস্তাব দেন না। তার করুণা তাঁর বিধান ও কার্যপদ্ধতির মধ্যেই নিহীত থাকে। কাজেই, কর্মের তত্ত্ব অনুযায়ী যা ঘটবে প্রার্থনাগুলো তা অগ্রাহ্য করবে না। প্রার্থনাগুলো যা করে তা হলো সে আপনার নিজের ইচ্ছাগুলোকে শক্তিশালী করবে যাতে কাল আপনি আপনার ইচ্ছাকে সঠিক পথে চালনা করেন এবং এভাবেই, সামনের ভুলগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন

কিন্তু এখনও, কেন আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত ? সর্বোপরি, তিনি কখনও ক্ষমা করেন না ! ঈশ্বরের উপাসনায় কি উপকার হয় ?

ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত, এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা উচিত।

এটা সত্য যে, ঈশ্বরের পূজা দ্বারা আপনি ব্যর্থ হলে শর্টকাট পাসের শংসাপত্র (certificate) পাবেন না। একমাত্র অলস এবং প্রতারকগন সফলতার জন্য এই ধরনের অযাচিত উপায় কামনা করে। ঈশ্বরের উপাসনার উপকারগুলি ভিন্নঃ

ইশ্বরের উপাসনা দ্বারা, একজন ব্যাক্তি ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন।

উপাসনা দ্বারা, একজন ভালভাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে এবং এগুলোকে তার নিজের জীবনে গ্রহণ করতে পারেন। এটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে, ভবিষ্যতের পাপের উৎসকে ধ্বংস করে, সত্য ও সমবেদনার গুণাবলীকে উৎসাহ দেয় এবং সত্য ও পরমসুখের কাছাকাছি আসে।

উপাসনা দ্বারা, যে কেউ 'ভেতরের কন্ঠস্বর' ভালভাবে শুনতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত পরিষ্কার নির্দেশিকা পেতে পারেন।

উপাসনা দ্বারা, একজন ব্যাক্তি অজ্ঞতা দূর করেন, শক্তি লাভ করেন এবং আত্মবিশ্বাস এবং আত্মরক্ষার সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ সহ্য করতে পারেন।

পরিশেষে, একজন ব্যাক্তি অজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পারেন এবং পরম সুখের সাথে মোক্ষ বা পরিত্রাণ অর্জন করতে পারেন।

আমি উপাসনার জন্য আরো একটি কারণ যোগ করতে চাই ।

ঈশ্বর আমাদের জন্য এত কিছু করেছেন এবং অবিরামভাবে তা অন্তহীন চালিয়ে যাবেন। এবং তাই, আমাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানোটা স্বাভাবিক ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের মরনশীল মা বাবাকে ধন্যবাদ জানাই তাদের আর্শ্বীবাদের জন্য। শুধুমাত্র একজন দুর্ভাগা স্বার্থপর ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে না এবং তার হৃদয়কে শুদ্ধ করার সুযোগ হারাবে ।

দয়া করে মনে রাখবেন যে, উপাসনা যন্ত্রের মতন মন্ত্র উচ্চারনের কিছু নয় বা মনের শূণ্যতা নয় । কর্ম, জ্ঞান এবং গভীর চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান আত্মভুত করার এটি একটি প্ররোচনাদায়ক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন

আমাদের কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত?

ঈশ্বরের উপাসনা নিহীত আছে আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মে । সত্য উপাসনা বলতে ক্রমাগত ভিত্তিতে 'ভিতরের কন্ঠস্বরকে' অনুসরণ করা বোঝায় । এটাকে বলা হয় যজ্ঞীয় জীবনযাপন করা অর্থাৎ মহৎ উদ্দেশ্যে স্বার্থহীন কর্মে নিয়োজিত হওয়া।

এটিকে কর্মের মাধ্যমে উপাসনা করা বলা হয় । যাইহোক, কোন ব্যাক্তি তার জীবনকে বিপথে না নিয়ে পবিত্রভাবে উত্তম পদ্ধতিতে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য, তাকে আরো দুটি দিক নিয়ে অনুশীলন করতে হবেঃ

জ্ঞান অন্বেষন করা

আমাদের সংস্কারের অংশ হিসাবে জ্ঞানকে আত্মভুত করতে জ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হওয়া ।

জ্ঞান-গভীর মনোযোগ-কর্ম এই তিনটি একত্রে চলে এবং বিচ্ছিন্নতাতে ফলহীন হয় ।

প্রশ্ন

ঈশ্বর উপাসনার মূল উপাদান কি কি?

ঈশ্বরের উপাসনার তিনটি প্রধান উপাদান আছে:

স্তুতি

প্রার্থনা

উপাসনা বা যোগীয় অনুশীলন

প্রশ্ন

ঈশ্বর "স্তুতি" কি ? এর ধরন কি?

স্তুতি বা প্রশংসার অর্থ হল যে কোনো সত্তার সঠিক গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রকাশ করা । অতএব, কোনকিছুর 'মিষ্টি কথায় ভোলানো মিথ্যা', সেইসাথে 'অযৌক্তিক নিন্দা,' উভয়ের কোনটাই স্তুতি নয়।

ঈশ্বরের স্তুতির উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝা এবং তাঁর সাথে সংগতি রেখে আমাদের নিজেদের প্রকৃতি এবং কর্মকে সে অনুযায়ী রূপ দিতে চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, ঠিক যেমন ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু, আমাদেরও উচিত ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়া। ঈশ্বর কখনোই হতাশ হন না, এবং তাই, আমাদেরও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

একজন ব্যক্তি যিনি কেবল একজন নাট্যশিল্পীর মতো ঈশ্বরের গুনগান করেন কিন্তু তার নিজের চরিত্র পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন না, তিনি আসলে স্রেফ সময় নষ্ট করছেন কারন ঈশ্বর আত্মমুগ্ধ বা স্বৈরশাসক নন, যে তিনি প্রশংসায় আনন্দ পাবেন। যাই হোক আমরা যে স্তুতি করি তা আমাদের নিজস্ব উন্নতির দ্বারা শুধুমাত্র আমাদের কল্যানের জন্য।

প্রশ্ন

স্তুতি কয় ধরনের?

দুটি ধরনের স্তুতি আছেঃ

সগুন স্তুতিঃ যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো ঈশ্বরে বিদ্যমান, সেগুলোকে স্মরণ করা ও বুঝার মাধ্যমে প্রশংসা করা। উদাহরণস্বরূপ, তিনি শ্বাশত এবং বিশুদ্ধ।

নির্গুন স্তুতিঃ যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি ঈশ্বরের মধ্যে উপস্থিত নয় সেগুলোকে স্মরণ করা ও বোঝার মাধ্যমে প্রশংসা করা । উদাহরণস্বরূপ, তাঁর কোন আকার নেই, এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেন না।

পার্থক্যটা কেবল ভাষাগত এবং মূল তত্বগত নয়।

প্রশ্ন

ঈশ্বরের "স্তুতি" আছে এমন কিছু বৈদিক মন্ত্র কি আপনি প্রদান করতে পারেন ?

বেদের প্রধান বিষয় ঈশ্বর। অতএব, ঈশ্বরের স্তুতিমূলক বহু সংখ্যক মন্ত্র রয়েছে যা বেদের অংশ। উদাহরণ স্বরূপঃ

যজুর্বেদ ৪০/৮

তিনি সকল কিছুতেই বর্তমান, গতিমান এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, বিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সকল কিছুর জ্ঞাতা, সকলের প্রভু, শ্বাশত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বেদের জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সকলকে পথ প্রদর্শন করেন। (এটি সগুন স্তুতি।)

তিনি শরীরবিহীন, তিনি কখনই জন্ম নেন না, তাঁর কোন স্নায়ু বা খুঁত নেই, তিনি পাপ আচরণ করে না এবং ব্যথা ও দুঃখ থেকে আলাদা। (এটি নির্গুন স্তুতি।)

অথর্ববেদ ১০/৮/১ এবং ১০/৭/৩২-৩৪

তিনি নিখুঁতভাবে জানেন অতীতে কি ঘটেছে, বর্তমানে কি ঘটছে এবং ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে। তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র জগতকে পরিচালনা করেন এবং আমাদের সকলের প্রভু। তিনি নিজেই স্বয়ং আনন্দময় এবং দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ দূরে! তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা তাঁকে নমষ্কার করি!

তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেখানে আমরা বাস করি এবং (সৃষ্টি করেছেন) মহাবিশ্বকে একই সাথে সেই সব কাঠামোকে যা আমাদেরকে আলোক দান করে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা তাঁকে নমষ্কার করি!

সৃষ্টির প্রতিটি চক্রের মধ্যে তিনি সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেন। তিনি আমাদের কল্যানের জন্য আগুন তৈরি করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা তাঁকে নমষ্কার করি!

তিনি বায়ু সৃষ্টি করেন যাহাতে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহন করি ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি। তিনি আলো সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমরা দেখি। তিনি সকল দশটি দিকের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং অনিন্দ্যসুন্দর ও সমন্বয়ের সহিত পরিচালনা করছেন, যাতে আমরা সর্বাধিক উপকৃত হই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা তাঁকে নমষ্কার করি!

যজুর্বেদ ২৫/১৩

তিনি আমাদের আত্মায় জ্ঞানের শক্তি প্রদান করেন। তিনি আমাদের সকলকে সত্য জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করেন। সমস্ত পন্ডিত তাঁর এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করে। বুদ্ধিমান মানুষেরা অব্যাহত আনন্দ লাভের জন্য এবং পরিত্রাণ লাভের জন্য বেদে প্রণীত তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করেন। শুধুমাত্র তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণেই আছে দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি এবং দুর্বৃত্রতায় লিপ্ত থাকার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকাই কেবল বারবার

জন্মমৃত্যু চক্রের ফাঁদে পড়ার কারণ । তাই, আমাদের উচিত তাকেই এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা যিনি আনন্দ ও সুখের একমাত্র সংজ্ঞা।

প্রশ্ন

প্রার্থনা বা ঈশ্বরের প্রার্থনা কি ?

মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সেরা প্রচেষ্টা করার পর) ঈশ্বরের নিকট হতে সহায়তা পাবার জন্য অনুরোধ করাই হলো প্রার্থনা। এটা প্রার্থনা হয় না, যখন আমরা খারাপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুরোধ করি বা আমরা যখন নিজের সেরা প্রচেষ্টা করা ছাড়া কোন অনুরোধ করি। প্রার্থনা দুষ্টের জন্য নয় আবার অলসের জন্যও নয়।

এইভাবে, আমরা ঈশ্বরের নিকট যা কিছুই প্রার্থনা করি না কেন, আমাদেরকে একই সাথে ঐ বিষয়টিকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে আমাদের উচিত জ্ঞান অন্বেষনের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করা । যথাযথ প্রচেষ্টা করা হয়েছে শুধুমাত্র পরে প্রার্থনা করা মানে। বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজের প্রত্যাশা ভিক্ষুকের চিহ্ন, ঈশ্বরের উপসকের নয়, যিনি নিজেও একমুহুর্তের জন্য ও অলস হননা । অতএব, যথাযথ পরিশোধ করুন এবং তারপর আপনার খাবারের জন্য অনুরোধ করুন ।

অসৎ প্রার্থনাগুলো বিপরীত ফল আনে কারণ এগুলো ব্যাক্তির মনকে দূষিত করে এবং ব্যাক্তির জন্য আরও দুঃখকে ডেকে আনে । উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর এই ধরনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন যেমন-

"হে ঈশ্বর, আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও এবং আমাকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও মহিমান্বিত করো ।" কারণ উভয় শত্রুই যদি একইরকম প্রার্থনা করে, তবে কি ঈশ্বর তাদের দুজনকেই ধ্বংস করবেন ?

কেউ যদি যুক্তি দেন যে ঈশ্বর দুজনের মধ্যে যিনি অধিকতর আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন তার (প্রার্থনা) শুনবেন, তাহলে এই যুক্তি দ্বারা, যে ব্যক্তি কিছুটা কম আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে অন্ততপক্ষে তার কিছুটা ক্ষতি হওয়া উচিত, যদিও এর পরিমান তার শত্রুর চেয়ে কম !

এটি সম্পূর্ণ মূর্খ যুক্তি !

অনুরূপভাবে, যদি কেউ প্রার্থনা করেন, যেমনঃ হে ঈশ্বর আমাদের জন্য মিষ্টি তৈরি করুন, দয়া করে আমার ঘর পরিষ্কার করুন, আমার পোষাক ধুয়ে ফেলুন, আমার ফসল কাটুন ইত্যাদি"।

সোজাকথায় সে একটা বোকা।

যজুর্বেদ ৪০/২

ঈশ্বর আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ "ভালভাবে চেষ্টা করে ১০০ বছর বা তার বেশি সময় বাঁচ এবং কখনো অলস হয়ো না।"

যারা ঈশ্বরকে এই আদেশ উপেক্ষা করে না তারা কখনোই সুখ অর্জন করতে পারে না, যদিও তারা হয়তো অন্যান্য গুণাবলিতে উন্নতচরিত্র হতে পারে তাও (সুখ অর্জন করতে পারে না) ।

কঠোর পরিশ্রম বা পুরুষার্থ হল জীবনে আত্মভুত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । বাকি সব উত্তম গুণগুলি ধরে নেয় যে পুরুষার্থ গুনাবলিটি ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছে ।

অন্য কথায়, ভাগ্য সাহসীদের পক্ষে ।

আমরা কেবল তাদেরই চাকুরীতে নিয়োগ দেব যারা কাজ করে, কিন্তু অলসদের নিয়োগ দেব না । কেবলমাত্র যাদের চোখ আছে এবং দেখার ইচ্ছা আছে তারাই কিছু দেখতে পারে । চিনিকে উপার্জন করে ও এটিকে খাওয়ার দ্বারাই কেবল চিনির স্বাদ গ্রহণ করা যাবে, "চিনি মিষ্টি" শুধুমাত্র এটি বলে চিনির স্বাদ গ্রহন করা যাবে না । একইভাবে, শুধুমাত্র সেই ব্যাক্তি, যে উত্তম কার্য করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে অবশেষে চিনি (মিষ্টতা) অর্জন করবে, শীঘ্রই বা দেরিতে।

প্রশ্ন

আপনি কি ঈশ্বর এর প্রার্থনা সংক্রান্ত কিছু মন্ত্র বেদ থেকে প্রদান করতে পারেন?

আসলে অনেক মন্ত্র দিতে পারি ! আসুন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সংক্রান্ত জীবনের সবচেয়ে সুখী কার্য্যক্রম উপভোগ করুন। কিন্তু এর আগে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সর্বোত্তম, অবিরাম, কঠোর এবং উদ্যমী প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের হোমওয়ার্ক করছি।

যজুর্বেদ ৩২/১৪

হে অগ্নি (আলোকিত ঈশ্বর), সেই বুদ্ধির সাথে আমাদের আশীর্বাদ করুন, যার মাধ্যমে যোগীগন এবং পণ্ডিতগন আপনার পূজা করে । এবং এখনই আমাদের সেই মেধা প্রদান কর ! আমরা কোন আত্মম্ভরিতা ছাড়াই আপনার নিকট আমাদের সবকিছু আত্মসমর্পণ করার অঙ্গীকার করা। সর্বোপরি, আপনিই সকল কিছুর উৎস যা আমরা অধিকার করি !

যর্জুবেদ ১৯/৯

আপনি প্রতিভাময়, আমাদের প্রতিভা প্রদান করুন।

আপনি অসীম সাহসী এবং পরাক্রমী, আমাদেরকে একই সাহস ও পরাক্রম প্রদান করুন।

আপনি সর্ব শক্তিমান, আমাদেরকেও মানসিক ও শারিরীকভাবে শক্তিশালী এবং বলবান কর ।

আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম, আমাদেরকেও সক্ষম কর।

আপনি অপরাধ এবং অপরাধীদের উপর ক্রোধ প্রদর্শন করেন । আমাদের প্রস্তুত করুন আমরাও যেন অপরাধ এবং অপরাধীদের উপরও একইভাবে রাগ দেখানোর অভ্যাস গড়ে তুলি ।

আপনি সকল প্রশংসা বা সমালোচনা সহ্য করেন । তেমনি প্রশংসা বা সমালোচনা উপেক্ষা করা এবং শুধুমাত্র লক্ষ্যের দিকে মনোযোগী হতে আমাদেরকে পর্যাপ্ত শক্তি দিন ।

অন্য কথায়, মন্দ থেকে দূরে ধার্মিকতার প্রতি আমাদেরকে চালিত কর।

যজুর্বেদ ৩৪ / ১-৬ (শিব সংকল্প মন্ত্র)

হে প্রিয় ঈশ্বর ! আপনার আশীর্বাদের সাথে, আমার মন সকল ধরনের জ্ঞানের বহু দূর অব্দি যায়, যখন জাগ্রত থাকি । এমনকি ঘুমের সময়, এটি একইভাবে কাজ করে । আপনার দান আমার এই শক্তিশালী মন যেন সদা সকল পাপ থেকে দূরে থাকে এবং সবসময় যেন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চিন্তায় থাকে । আমি যেন সর্বদাই সকলের কল্যানের চিন্তা করি এবং কখনও যেন কারো ক্ষতি কামনা না করি।

হে সর্বজ্ঞ, এই মন ধৈর্যশীল পণ্ডিতদেরকে এবং উন্নত চরিত্রের মানুষদেরকে চালিত করে উত্তম কাজ করতে এবং ক্রমাগত মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে । এই মন বিপুল সম্ভাবনাময় এবং সকল জীবের কল্যাণে নিমজ্জিত থাকতে পারে । এমন উন্নত মন যেন মন্দ থেকে দূরে চালিত করে এবং শুধুমাত্র পবিত্র চিন্তা কামনা করে।

এই মন মহান জ্ঞান প্রদান করে । এইটি এক ও সকলকে আলোকিত করে এবং আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে । তার সমর্থন ছাড়া এমনকি একটি কাজও সম্পন্ন করা যায় না । এই মহান মন সদা উন্নত চিন্তায় মগ্ন থাকুক এবং অসৎ কামনা থেকে দূরে থাকুক।

যোগীগন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত এই মনের মাধ্যমে জানেন । এই মন আমাদেরকে ঈশ্বরের সহিত একত্রিত হতে সহায়তা করে এবং পরম জ্ঞান সন্ধান করতে সাহায্য করে। এই

মন পাঁচ ইন্দ্রিয়, আত্মা এবং বুদ্ধির সাথে একত্রে কাজ করে সৎকাজ পরিচালনা করতে। এই মহান মন সদা বিশুদ্ধ থাকুক এবং সকলের কল্যান করুক।

চারটি বেদ - ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদের জ্ঞান মনের মধ্যেই গেঁথে থাকে, যেভাবে একটি চাকার কেন্দ্রে অর (spoke) সংযুক্ত করা হয়। এই মন ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি সাক্ষ্য, যিনি সবসময় এটির মধ্যে এবং এর চারপাশে অর্ন্তভুক্ত আছেন। এমন মন যেন সদা উন্নত কর্মের প্রতি নিবেদিত থাকে যাতে করে আমি সকল অজ্ঞতা দূর করে আমার ভেতর নিহীত থাকা বৈদিক জ্ঞানকে আবিষ্কার করতে পারি।

মন মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রন করে যেমনভাবে রথচালক রজ্জু দ্বারা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রন করে। এটা অত্যন্ত গতিসম্পন্ন এবং সদা আমার সাথে থাকে। এমন মন যেন সর্বদা সকলের জন্য কল্যাণ এবং উন্নত চিন্তা অন্বেষন করে এবং কখনও যেন পাপের মধ্যে বসবাস না করে।

যর্জুবেদ ৪০/১৬

হে সুখ প্রদানকারী, আত্মপ্রকাশকারী, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, আপনি আমাদের সঠিক বুদ্ধি প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে পাপ কর্ম থেকে দূরে চালিত করুন। আমাদের চিন্তা, শব্দ, এবং কর্মকে শুদ্ধ করার জন্য আমরা বারংবার আপনার নিকট প্রার্থনা করি।

যজুর্বেদ ১৬/১৫

হে রুদ্র (দুঃখী মানুষকে কাঁদতে ও কষ্ট ভোগ করতে পারে এমন ব্যক্তি)! দয়া করে আমাদের সকলকে পথ প্রদর্শন করুন যাতে আমাদের কেউ, আমাদের কনিষ্টদের, আমাদের জ্যেষ্ঠ্যদের, আমাদের পিতামাতাদের, গর্ভের প্রাণীদের, আমাদের প্রিয়জনদের এবং সকল নির্দোষ নিরীহ জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করে। আমাদেরকে সেই পথ থেকে দূরে চালিত করুন যে পথ আমাদেরকে আপনার শাস্তির সম্মুখীন করতে পারে।

শাতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৩/১/৩০

আমরা যেন মিথ্যার পথ পরিহার করি এবং সত্যের প্রতি অগ্রসর হই। আমরা যেন অন্ধকারের পথ পরিত্যাগ করি এবং আলোর দিকে প্রতি অগ্রসর হই। আমরা যেন মৃত্যুর পথ প্রত্যাখ্যান করি এবং মোক্ষের মাধ্যমে শাশ্বত অমরত্ব অন্বেষন করি। হে ঈশ্বর! অনুগ্রহ করে আমাদের পথ প্রদর্শক হও!

যজুর্বেদ ২/১০

হে ধনবান ঈশ্বর! দয়া করে একটি সুস্থ শরীর, সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং ভালো অভ্যাসের সাথে অত্যন্ত উন্নতচরিত্র মানসিকতার সাথে আমাকে স্থিতিশীল কর। অনুরোধ করি আমাদের

সহায়তা করুন যাতে আমরা আমাদের দেশকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে পারি। আমাদের মহান ইচ্ছাগুলো সদা জয়ী হোক এবং আমরা যেন শুধুমাত্র মহান কর্মের আচরণ অন্বেষন করি। আমরা যেন একটি শক্তিশালী চক্রবর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে পারি এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমরা যেন দুর্নীতি, জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত শক্তিকে যা আমার দেশকে পীড়িত করে, তাকে লড়াই করে দূর করে দিতে পারি।

ঋগ্বেদ ১/৩৯/২

আমরা যেন সদা শক্তিশালী হই। আমাদের অস্ত্র, বন্দুক, কামান, গোলাবারুদ, ইত্যাদি যেন সবসময় প্রস্তুত এবং সঠিক স্থানে থাকে। আমাদের অস্ত্র এবং শক্তি যেন অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় যারা নির্দোষ মানুষকে ক্ষতি করতে চায়। আমাদের অস্ত্র ও শক্তি যেন তাদের সৈন্যশক্তিকে থামাতে পারে। আমাদের অবিসংবাদিত শক্তি, বিক্রম ও সাহস আমাদের সহায়তা করুক একটি স্বাধীন, শক্তিশালী, কল্যাণকর ও এবং ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে যাতে দূর্নীতি, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারনা ও অপরাধের শক্তিসমূহ আমাদের দ্বারা পরাজিত হতে থাকে। কিন্তু আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের জন্য, শুধুমাত্র আমরা যখন সত্য, করুণা, ন্যায় এবং মহত্বের পথে থাকব। যারা এমনটা (অর্থাৎ শক্তিমান হতে) আকাঙ্খা করে কিন্তু জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতক, অন্যায়কারী এবং অপরাধী, তারা সদা ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের দ্বারা পরাজয়ের গ্লানী ভোগ করে। তাই, আমাদের উচিত শুধুমাত্র মহৎ কাজে নিয়োজিত হওয়া।

যজুর্বেদ ৩৮/১৪

আমরা যেন শুধু ধর্মীয় কাজ করতে ইচ্ছুক হই। ভাল স্বাস্থ্যকর খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীর যেন সদা শক্তিশালী ও বলশালী হয়। আমরা যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যেতে পারি। আমরা যেন বেদ বুঝতে এবং আমাদের কল্যানের জন্য সেই বেদ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের যেন ব্রাহ্মণগন (পণ্ডিতগন) থাকেন যারা আমাদের ভাল জ্ঞান প্রদান করতে পারে। আমাদের যেন সাহসী ক্ষত্রিয় (যোদ্ধাগন) থাকে যাতে আমরা একটি শক্তিশালী জাতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং আমাদের দেশের ভেতরে এবং বাইরে থাকা জালিয়াতি শক্তিকে ধ্বংস করতে পারি। আমাদের যেন বিশেষজ্ঞরা থাকেন যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং প্লেন, যানবাহন, উপযোগী গ্যাজেট, মেশিন ইত্যাদির বিকাশে সহায়তা করেন। আমরা যেন সদা শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের পথে থাকি। আমরা যেন কোন জীবিত সত্তার সঙ্গে কোনরূপ শত্রুতা পোষন না করি। আমাদের যেন একটি শক্তিশালী দেশ, অসাধারন সম্পদ ও উন্নত চরিত্র থাকে।

আমরা যেন আমাদের সবকিছু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি, যিনি আমাদের মা, বাবা, বন্ধু এবং গুরু। আমাদের সমগ্র জীবন, আমাদের জীবনী শক্তি, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি, আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের সুখ, আমাদের আত্মা, আমাদের আলোকায়ন এবং জ্ঞান, আমাদের কর্মের ফলাফল, আমাদের বলিদান, আমাদের প্রশংসা স্তুতিসমূহ, আমাদের আবেগ, আমাদের মহান অর্জন, সবকিছুই (ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি)। যেহেতু, আমরা যা অধিকার করি ঈশ্বর তার সকলকিছুরই উৎস। অন্য কথায় বলা যায়, যা কিছুই আমরা জীবনে ভাবি বা করি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে অর্জন করা। এই পরম সমর্পণই আমাদের জীবনের মন্ত্র হওয়া উচিত!

যজুর্বেদ ১৮/২৯

আমরা যেন আমাদের শাসক হিসাবে একমাত্র তাঁকেই (ঈশ্বরকে) বিবেচনা করি এবং অন্য কোন বংশ, ব্যক্তি বা দলকে আমাদের শাসক হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। আমরা যেন শুধুমাত্র তাঁর (ঈশ্বরের) সৃষ্ট বিধান অনুসরণ করি এবং মনুষ্য সৃষ্ট বিধানের অনুসরণ না করি যদি তা ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে যায়। আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ একত্রিত হয়ে ঐসব শক্তিকে ব্যার্থ করে দেই যারা ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদেরকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদেরকে বাধ্য করে। অন্য কথায়, আমরা যেন সকলে একত্রিত হই, একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই না করি এবং চিন্তা, শব্দ ও কর্মের মধ্যে কেবল সত্যের অনুসরণ করি।

আসুন আমরা পরম ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হই এবং কোন এক ব্যক্তির বা অযোগ্য গোষ্ঠীর খেয়ালখুশি দ্বারা পরিচালিত না হই।

প্রশ্ন

ঈশ্বর উপাসনা কি?

উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া। অন্য কথায়, উপাসনা বলতে ঈশ্বরকে ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করাকে বোঝায় যাতে আমরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চিন্তা করতে, কাজ করতে এবং কথা বলতে পারি। এভাবেই, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য এবং সরাসরি প্রমাণের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে আমাদের যে সমস্ত কার্যক্রমগুলি প্রয়োজন এগুলোই 'উপাসনা'এর অধীনে।

যিনি অজ্ঞতার সব বীজ ধ্বংস করেছেন এবং উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়েছেন সেই ব্যাক্তি সুখ ও আনন্দের এমন একটি স্তরকে অনুধাবন করেন যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না শুধুমাত্র নিজের মধ্যে অনুভূত হতে পারে।

প্রশ্ন

আমরা কিভাবে উপাসনা করতে পারি ?

উপাসনা একটি দীর্ঘ বিষয় এবং যোগ দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত। আমি এখানে খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করছি।

উপাসনার প্রথম ধাপে নিম্নলিখিতগুলি করা প্রয়োজন । মনে রাখবেন যে এটা অবশ্যক এবং উপাসনা পদ্ধতির পরবর্তী ধাপটি অর্থবহ হবে কেবলমাত্র তখনই যখন শিক্ষার্থী তার সেরা প্রচেষ্টাটা প্রথম ধাপে দেবে। এর দুটি উপাদান রয়েছেঃ

যম

অহিংসা - কারো প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা না করা। শুধুমাত্র সমবেদনার অনুভূতি

সত্য - জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সত্যকে গ্রহণ এবং মিথ্যাকে বর্জন।

অস্তেয় - (চুরি না করা) যা বৈধভাবে নিজের নয় তাকে বর্জন করা।

ব্রহ্মচার্য (নৈতিকতা) - স্ব-নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা, লম্পট না হওয়া, জ্ঞান এবং কাজ করার অঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

অপরিগ্রহ (নম্রতা) - নম্র হওয়া এবং কোন মিথ্যা অহংবোধ না থাকা।

নিয়ম

শৌচ (বিশুদ্ধতা) - মনের বিশুদ্ধতা এবং ভাল স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন।

সন্তোষ (সন্তুষ্টি) - ব্যার্থতা, সাফল্য, সন্মান বা অপমান ইত্যাদি বিবেচনা না করে অলসতা পরিহার করে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উত্তম কর্মের জন্য সেরা প্রচেষ্টা করা।

তপ (প্রচেষ্টা) - ঈশ্বরের পথে আনন্দ এবং ব্যথাকে উপেক্ষা করা এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

স্বাধ্যায় (গভীর চিন্তা) - জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা, ভাল সঙ্গীর খোঁজ করা এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা এবং ওম শব্দের মানে, ইত্যাদি।

ঈশ্বর প্রনিধান (ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ) - ঈশ্বরের পথে ইচ্ছাকে সমর্পণ করা।

এই মূল বিষয়গুলি বোঝার পর, আমরা প্রকৃতপক্ষে যোগের বিশাল আঙ্গিনায় প্রবেশ করার যোগ্য হব।

এখানে উল্লেখ্য, এর মানে এই নয় যে আপনি এইগুলোর উপর দক্ষতা অর্জনের পরেই শুধুমাত্র পরবর্তী ধাপ শুরু করতে পারেন। যেহেতু এই পদক্ষেপগুলি সমগ্র উপাসনা প্রক্রিয়ার সারাংশ ধারণ করে। কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে, আপনাকে অন্ততপক্ষে, এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে এবং সত্যিকারভাবে এই বিষয়গুলোর উপর কাজ করে যেতে হবে। আপনি ব্যর্থ হতে পারেন কিন্তু সবসময় আবার দৃঢ়সংকল্পের সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে এই যম ও নিয়মে দক্ষ হওয়ার জন্য।

প্রশ্ন

আমরা কিভাবে একটা উপাসনা পর্ব পরিচালনা করব ?

যখনই কেউ উপাসনা করতে চায়, তার উচিত

একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা খোঁজা

একটি শান্ত অবস্থানে বসা।

কিছু প্রাণায়াম অনুশীলন করা (মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি)।

(লক্ষ্য রাখুন, আনুলোম, বিলোম এবং কপালভাতি বর্তমান সময়ে জনপ্রিয়। তারা শুধুমাত্র শারীরিক ব্যায়াম যা যোগব্যায়ামের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না।)

মানুষের মনকে জগতের চারপাশ থেকে একক কেন্দ্রে আনতে নাভীকুন্ড, গলা, চোখের কেন্দ্র, পিঠ, মাথা, পাঁজরের কেন্দ্র ইত্যাদির মত শরীরী কেন্দ্রীয় অংশের কোন শারীরিক অংশের দিকে (মনোযোগ) কেন্দ্রীভুত করুন।

ঈশ্বর এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করুন। ধীরে ধীরে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি মানসিক সংযোগের দিকে চালিত হোন এবং তার প্রশান্তির মধ্যে মগ্ন হোন। বাকি বিশ্বকে যেতে দিন। এমনকি যদি বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা আসে, আপনি স্রেফ উপেক্ষা করুন ঠিক যেভাবে সুন্দর সঙ্গীত উপভোগ করার সময় আপনি মশাকে উপেক্ষা করেন।

দুর্বলতা এবং পাপ চিন্তাধারা অপসারণ করতে সিদ্ধান্ত নিন এবং নিজেকে বিশুদ্ধ করতে এখনই সিদ্ধান্ত নিন।

প্রশ্ন

উপাসনার সুবিধা কি?

আমরা অধ্যায়ে শুরুতে কিছু বেনিফিট তালিকাভুক্ত করেছি। এখানে আরও কিছু আছেঃ

যে ব্যাক্তি উপাসনা অনুশীলন করে সে দ্রুত তার মনকে বিশুদ্ধ করে তোলে এবং সত্য ভিত্তিক করে তোলে। যেহেতু সত্যই হলো শান্তি, এইটি তাকে প্রস্তুত করে, তার জীবনকে উপভোগ করতে এবং অন্যান্য সমকক্ষ ব্যাক্তিদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি উপভোগ করতে।

ধীরে ধীরে এই সত্য = সুখ এই তত্ব তাকে মোক্ষের পরম সুখের দিকে নিয়ে যায় যেখানে আর কোন দুঃখ নেই। এর চেয়ে অর্জনযোগ্য ভালো কোন অবস্থা নেই। (অর্থাৎ এটিই সর্বোচ্চ আনন্দময় অবস্থা)

যে ব্যক্তি ২৪x৭x৩৬৫ (অর্থাৎ প্রতি মুহুর্তে) ঈশ্বরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে, সে সর্বদা জীবনে আরো সুখ ও আনন্দের দিকে অগ্রসর হয়। সে, তার সমকক্ষ ব্যাক্তিদের মধ্যে যারা উপাসনা করে না তাদের তুলনায় হয়ে উঠে আরো সক্ষম, তৎপর, উদ্যমী এবং সফল।

সংক্ষেপে, উপাসনা একজন ব্যাক্তিকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল করে তোলে। সর্বোপরি, একমাত্র ঈশ্বরই সকল পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সুখের উৎস!

ঠিক যেমন ঠাণ্ডা শীতকালে একজন কম্পনরত ব্যক্তি আরাম বোধ করে, যখন তিনি আগুনের কাছাকাছি চলে আসেন, অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে আত্মার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়, তাঁর প্রকৃতি, কর্ম এবং প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সাথে সমন্বয় সাধন করে, এবং তাই তিনি পরম আনন্দ ও শুদ্ধতা অর্জন করেন।

ঈশ্বর এর উপাসনা ব্যাক্তির ইচ্ছাশক্তিকে এত দৃঢ় করবে যে সে ব্যাক্তিটি জীবনের এমন বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে যেটা অন্যদের জন্য অসম্ভব মনে হতে পারে। জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, ঐ ব্যক্তি তার শান্তভাব বজায় রাখতে সক্ষম হন এবং সফলভাবে এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশ্চর্য অর্জন আর কি হতে পারে!

এ ছাড়াও, যারা ঈশ্বরকে পূজা করে না, তারা বোকা একইসাথে নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ। কারন কেউই সেই এককে (ঈশ্বরকে) উপেক্ষা করতে পারেনি, যিনি সমগ্র জগত সৃষ্টি করে আমাদের অত্যন্ত সুখ দিয়েছেন এবং আমাদের ধারন করে যাচ্ছেন। শুধু ভাবুন, যারা তাদের নিজেদের অভিভাবকদেরকে প্রত্যাখ্যান করে এমন অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর এবং মূঢ় ব্যাক্তিকে কি শাস্তি আমাদের দেয়া উচিত।

{৩}

আত্মার ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

আমি কে?

আপনি আত্মা বা জীব। আপনি আপনার মন এবং শরীর থেকে ভিন্ন। যখন শরীর ধ্বংস হয়ে যায়, তখন আপনি ধ্বংস হয়ে যান না কারণ মহাবিশ্বে এমন কোন সত্তা নেই যা আপনাকে ধ্বংস করতে পারে। ঈশ্বরের মতো আপনি অমর।

প্রশ্ন

কিন্তু কিভাবে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে ঈশ্বর এবং আত্মা অমর ?

সংক্ষেপে বললে, যা কিছু অস্তিত্বমান সেটাই বর্তমান । অতীত এবং ভবিষ্যত বাস্তবে অস্তিত্বমান নেই। যখন আমরা পরিবর্তন ঘটতে দেখি, আমরা সময়ের একটি ধারনা পাই। অতীত এই পরিবর্তনের স্মৃতি ছাড়া কিছুই নয় । ভবিষ্যত এই পরিবর্তনগুলির একটি অজ্ঞাত অনুমান। এটি একটি মানসিক খেলা। বর্তমান হলো সেটাই যা বাস্তবে অস্তিত্বমান। তাই যদি একটি সত্তা বর্তমানে বিদ্যমান থাকে, এর অর্থ এটি অবশ্যই অতীতে অস্তিত্বমান ছিলো এবং সর্বদা ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকবে। অন্য উপায়ে বললে, কোন কিছুই সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

এখন, পদার্থ-শক্তির পরিবর্তন হয় কারণ তারা বস্তুগত সত্ত্বা এবং অন্য বস্তুগত সত্ত্বা দ্বারা প্রভাবিত হয় । কিন্তু ঈশ্বর এবং আত্মা বস্তুগত নয় তাই, তারা কোনো বস্তুগত সত্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। শুধু বিবেচনা করুন, কেন কোন সত্তার মৃত্যুর, ধ্বংস বা ক্ষয় হয় ? এটি ঘটে কারন ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশে অন্য সত্তার সাথে এর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হয় বা ক্ষয়ে যায় । কিন্তু যদি একটি সত্তা অন্য বস্তুগত সত্ত্বার সহিত বা বলের সহিত পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া না করে, ঐ সত্তাটির ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকে না । অতএব, ঈশ্বর এবং আত্মা কখনই মরবে না বা ধ্বংস হবে না।

সময়ের বাঁধাহীনতার রাজ্যে (অর্থাৎ যেটি সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, যেমন আত্মা) বর্তমানে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকাটা যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এটি সর্বদা বিদ্যমান ছিল, কারণ সময় মাপকাঠির সকল বৈশিষ্ট্য, সময়হীন অবস্থায় যথাযথভাবে সমতুল্য। অতএব, এটি হয় একই অবস্থায় থাকবে নয়তবা চক্রাকার কার্যক্রমে সঞ্চালিত হতে পারবে। সুতরাং, শুধুমাত্র গঠন পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু মৌলিক সত্তা পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন

আমাদেরকে (আত্মাকে) কে তৈরি করেছেন ?

যেমনটা আমি আগে বলেছি, মহাবিশ্বে এমন কোন সত্তা নেই যা আপনাকে ধ্বংস করতে পারে । আপনি ঈশ্বরের মত অমর । কারণ আপনি কখনই মরবেন না বা ধ্বংস হবেন না, কেউ আপনাকে সৃষ্টি করেনি ।

প্রশ্ন

অনেক ধর্মীয় পন্ডিত দাবি করেন যে ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা তাঁর উপাসনা করতে পারি। এটা কি সত্য না ?

যদি এইটি সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বর একটি প্রশংসা-আকাঙ্খী স্বৈরশাসক ছাড়া কিছুই নন যিনি শ্রেষ্ঠম্মন্যতায় (superiority complex) ভুগছেন ।

এটি প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সামঞ্জস্যহীন । তিনি তার অভ্যাস পরিবর্তন করেন । এ কারণেই শুরুহীন অবস্থা থেকে ঈশ্বর একা ছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি হঠাৎ আমাদের তৈরি করার চিন্তা করলেন ।

প্রশ্ন

কিন্তু ঈশ্বর নিখুঁত । সুতরাং কিভাবে তিনি সামঞ্জস্যহীন হতে পারেন ?

হ্যা আমি একমত, ঈশ্বর নিখুঁত । এর মানে হল যে সময়ের সকল ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই সমানভাবে নির্ভুল এবং অবশ্যই একই বিধান অনুসারে পরিচালনা করেন । পরিপূর্ণতা বলতে বোঝায় যে ঈশ্বরের আচরনে এমনকি সামান্যতম অসঙ্গতিও হতে পারে না ।

যদি গড / আল্লাহ / ঈশ্বর T1 সময়ে আমাদেরকে তৈরি করেন, তাঁকে অবশ্যই অন্য সময় বিভাগেও আমাদেরকে তৈরি করতে থাকতে হবে, কারণ তিনি নিখুঁত । কিন্তু তিনি আমাদেরকে দুইবার তৈরি করতে পারবেন না ! তাই তাঁকে আমাদেরকে ধ্বংস করতে হবে যাতে তিনি আবার আমাদের তৈরি করতে পারেন ।

কিন্তু যদি তিনি আমাদের বারংবার সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে থাকেন, তবে তিনি কীভাবে নিশ্চিত হবেন যে আমরা তাঁর উপাসনা করব, যখন আমরা ধ্বংস হব। এর অর্থ হলো, হয় আল্লাহ র মেজাজ মর্জি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় অথবা তিনি আমাদেরকে উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেননি ।

প্রশ্ন

দারুন যুক্তি! আমি বুঝতে পেরেছি ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু আমি কিভাবে জানব যে আমিই আত্মা এবং শরীর ও মন থেকে ভিন্ন ? আমি কি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া না ?

খুব সহজ! আপনার জন্মের পরে আপনার শরীর ও চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আপনি একই রয়েছেন। এমনকি নিয়মিত ভিত্তিতে, আপনি শরীর এবং চিন্তার পরিবর্তন বুঝতে পারেন। সুতরাং, আপনি শরীর এবং মন থেকে ভিন্ন। এই সচেতন অনুভূতি বা 'আমি' বাস্তবে আপনি। এই 'আমি' এখন প্রশ্ন করছে এবং এই বইটি পড়ছে এবং জানতে পারে যে 'আমি' বিদ্যমান। এই 'আমি' হলেন তিনি, যিনি বর্তমানে এই "'আমি' টা কে", এইটি অন্বেষনে আগ্রহী। এমনকি যখন আপনি স্বপ্ন দেখা ছাড়া ঘুমান, আপনি জেগে ওঠেন এবং বলেন যে আমার একটি ভাল ঘুম হয়েছে। এই 'আমি' টি ঘুমের শান্তি উপভোগ করেছে।

প্রশ্ন

কিন্তু কিছু মানুষ বলে যে চেতনা মস্তিস্কের রাসায়নিক ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং কোন আত্মা নেই। তারা বলে যে সব আবেগ এবং ব্যথা এবং আনন্দের অনুভূতি কেবল একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া।

এটিকে সত্য হিসাবে দাবী করার চেয়ে বোকামী কোন কিছু হতে পারে না। সাধারনত এই ধরনের মতামত বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত লোকেরা প্রদান করে যারা একটি থ্রেশহোল্ডের নীচে তাদের বুদ্ধি ফেলে দিয়েছে। তারা তাদের অপরাধবোধের অনুভূতি এবং 'ভিতরের কণ্ঠ' থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এবং এভাবে এ ধরনের অন্তঃসারশূণ্য কথায় নিমজ্জিত থাকে।

কিন্তু শুধু বিবেচনা করুন, যখন কেউ আপনাকে চপেটাঘাত করে, শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তখন ব্যথা অনুভব করতে নিউরনগুলো উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কিন্তু 'কে' ব্যথা অনুভব করে ? এবং যখন আপনার প্রশংসা করা হয়, আবার নিউরন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপনা দেয় এবং আপনি খুশি অনুভব করেন। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন, 'কে' খুশি অনুভব করে ? প্রকৃত সত্যটা হলো, কোনো কিছু অনুভূত হচ্ছে এর মানে কেউ না কেউ অনুভব করছে। স্পষ্টতই, একটি ইলেক্ট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন বা একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা একটি জলের অণু বা যাই হোক না কেন, তারা সেই অনুভবকারী 'আমি' টি হতে পারে না। এই 'আমি' যেটি অনুভব করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করে সেটি আমাদের শরীরের মধ্যকার আত্মা আমাদের সত্যিকারের আমি। এবং যেহেতু এটি একটি বস্তুগত সত্তা নয়, এটি আগুন, জল ইত্যাদি ইত্যাদির মত বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। সুতরাং, এটি অবিনশ্বর। সর্বোপরি, ধ্বংসের অর্থ বিভিন্ন উপাদানের ভাঙ্গন। সুতরাং কোনো কিছু যার কোন উপাদান নেই, তা

কিভাবে ভাঙ্গতে পারে? এছাড়াও, একটি স্থুল বিষয় একটি সুক্ষ্ম বিষয়কে ভাঙতে পারে না, যেমন একটি তলোয়ার একটি অনুকে ভাঙতে পারে না। এভাবেই আত্মা অবিনশ্বর হয় যেমনটা প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা দেয়।

প্রশ্ন!

দারুন কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কিভাবে থামাব যারা বলে আমরা শুধু রাসায়নিক বিক্রিয়া ?

এই বালকসুলভ 'রাসায়নিক বুদ্ধিজীবীদের' জিজ্ঞাসা করুন যে যদি এই সবকিছু রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে কেন তাদের সমস্যা হয় যখন আমরা তাদের যুক্তি খন্ডন করি ? এমনকি (তাদের ভাষায়) এটি একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়, তারপরও তারা ! কেন তারা ভালোবাসে, কেন তারা লাঞ্ছিত বোধ করে, কেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কেন তাদের মধ্যে তাদের জ্ঞানকে প্রচার করার আকাঙ্খা আছে ও বিরোধী যুক্তিকে কুসংস্কার বলার আকাঙ্খা আছে ? এছাড়াও, কেন তারা অপরাধের বিরুদ্ধে আইনকে বিরোধিতা করে না ? কেননা যদি সব কিছুই রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তাহলে কেন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে শাস্তি দেওয়া ? যখন কেউ কারো মুখের ক্ষতি করতে এসিড ছুড়ে মারে, তখন তুমি কি এসিডকে শাস্তি দিবে ? এভাবেই, যদি তারা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তাহলে কেন তাদেরকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে ? তারা যা বলছে, লিখছে বা বিতর্ক করছে সেগুলো হতে পারে স্রেফ একটা অর্থহীন এলোমেলো রাসায়নিক বিক্রিয়া যা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন দুটি অ্যাসিড রাসায়নিক ল্যাবে মেশানো হচ্ছে !

সারাংশে, যদি এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া বা অ-শাশ্বত সত্তা হয় তাহলে, আইন, আদেশ, প্রেম, আবেগ, শিক্ষা, চরিত্র, অপরাধ, শাস্তি, পুরস্কার, ক্রীড়া, বিনোদন, সমবেদনা ইত্যাদিগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। তাই এই তত্ত্বটি কেবল অর্থহীন বুদ্ধির অর্থহীন মানুষদের জন্য যারা মারা যেতেও কিছু মনে করবে না কারণ তাদের জীবনও অর্থহীন এবং খুনও একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া !

প্রশ্ন

ঠিক আছে, আসুন আমরা অর্থহীন বিতর্ক সরিয়ে রাখি। আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, আত্মা কি স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারে না কি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ?

এটা নির্ভর করে যখন মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যায় (প্রলয় হয়), আত্মা বিশেষ করে যারা মুক্তি বা মোক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, তারা মুক্ত ইচ্ছা ছাড়া চেতনাহীন হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সময়, আত্মাকে যখন তার কর্ম অনুযায়ী জন্ম দেওয়া হয়, তখন তাকে কাজ

করার জন্য সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করা হয় । যাইহোক, আত্মা নিজের জন্য কতটা স্বাধীনতা আকাঙ্খা করে এটাও বিশুদ্ধভাবে নির্ভর করে আত্মার উপর, তার কর্মের মাধ্যমে ।

প্রশ্ন

আপনি কি একটি উদাহরণের সাথে এইটি ব্যাখ্যা করতে পারেন ?

উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত ভারতীয়রা বিদেশীদের দাস হয়ে থাকতে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের উৎসাহপূর্ণ দাস মানসিকতার কারণে । তাই তাদের স্বাধীনতা সীমিত এবং এমনকি তাদের স্বদেশেও তাদের অপমানের মুখোমুখি হতে হয় । এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ঈশ্বর প্রদত্ত নয় বরং এটা তাদের নিজস্ব সমাজের সম্পূর্ণ বেছে নেয়া সিদ্ধান্ত । স্বতন্ত্র আত্মার স্তরে ঠিক একরমটাই ঘটে ।

অন্য কথায়, আত্মার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, ইশ্বর আত্মাকে কাজ করার স্বাধীনতার একটা সীমা প্রদান করেন । এবং তিনি একটি চলমান ভিত্তিতে এই সীমা পরিবর্তন করতে থাকেন ।

আমাদের সন্তানদের আমরা যে স্বাধীনতা প্রদান করি এটি তার সমতুল্য । যখন সে একটি শিশু, আমরা তাকে একটি ছোট খাটে সীমাবদ্ধ করি । যখন সে চার হাত পায়ে হাঁটা শুরু করে, আমরা তার চলাচলকে সীমাবদ্ধ করি, আমরা নিশ্চিত হই যে যাতে সে উচু বিছানা থেকে পড়ে না যায় । ধীরে ধীরে আমরা তাকে অধিক থেকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করি যতক্ষন সে পূর্নাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে । এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই, যদি আমরা দেখতে পাই যে সে বাচ্চাটি মেঝের উপর নোংরা জিনিস খাওয়ার খারাপ অভ্যাস গড়ে তুলছে, তাহলে মা তাকে এটি থেকে বিরত করার জন্য কিছু উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে বের করে । বাচ্চাটির স্বাধীনতা এইভাবে সীমিত । বিপরীতভাবে, যদি সন্তানটি একটি ভাল ছেলের মতো আচরণ করে এবং পিতামাতার আনুগত্য করে, নোংরা জিনিস না করে, তবে সেই বাচ্চাটি দ্রুত বর্ধিত স্বাধীনতা লাভ করেন।

ঈশ্বর আমাদের বাবা মায়ের মত, তিনি চলমান ভিত্তিতে এইটি করছেন একটি শুভ আশাবাদের গানিতিক পদ্ধতির (optimization algorithm) ক্রমাগত অনুকরনে । এবং তিনি আমাদের পিতামাতার মতই এইটি করেন, শুধুমাত্র আমাদের উপকারের জন্য ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আত্মা তার নিজের জন্য কতটা স্বাধীনতা চায় তা নির্ধারণে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন । অন্য কথায় এটি বলতে গেলে, আত্মা তার কর্ম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীন, কিন্তু তার কর্মের ফল পেতে এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ।

প্রশ্ন

'মুক্ত' এবং 'কর্মের ফল' এর অর্থ কী ?

"যে ব্যাক্তির 'ইচ্ছা', তার শরীর, ইন্দ্রিয়, এবং জীবনী শক্তির উপর শাসন বা নিয়ন্ত্রন করতে পারে তাকে স্বাধীন বলা হয়" । যদি আত্মা মুক্ত না হতো, তাহলে এটির ভালো বা মন্দ কর্মের ফল ভোগ করার কোন কারন থাকতো না (অর্থাৎ ভালো বা মন্দ কর্মফল আত্মাকে ভোগ করতে হতো না) । আত্মা যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের একটি পুতুলের মতো কাজ করে তাহলে ঈশ্বরকে ভালো বা মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে । কারণ আপনি যদি তলোয়ার দ্বারা কাউকে মেরে ফেলেন, তাহলে আপনিই শাস্তি পাবেন, তলোয়ার শাস্তি পাবে না ।

প্রশ্ন

কিন্তু যে সব গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ইতিমধ্যে আমাদের ভাগ্য লিখেছেন, তাদের ব্যাপারটা কি হবে ?

ঐ সকল গোষ্ঠী যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাদের সৃষ্টি করার আগেই তাদের ভবিষ্যতের কথা লিখে রেখেছেন, (অনেকটা মুসলমানদের লওহে মাহফুজের ন্যায় যেটা আল্লাহ্ এর সিংহাসনের নিচে) এই ধরনের মতবাদ প্রকৃতপক্ষে এটাই বলে যে, দুনিয়াতে যা ঘটছে সকল ভুলের জন্য আল্লাহ / গডের শাস্তি পাওয়া উচিত । সকল বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এই ধরনের স্পষ্টত স্ব-বিরোধীত তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করা ।

বেদ অনুসারে, আত্মা (স্বাধীনতার) সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে কর্ম করতে এবং তার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি এবং জীবনী শক্তিকে পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন । এবং তার কর্মের মাধ্যমে, এটি তার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রকে বাড়াতে বা হ্রাস করতে পারে । যখন সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়, তখন আত্মা ঈশ্বরের এর অনুপ্রেরণায় সুসংগতভাবে কাজ করে এবং সম্পূর্ণ মুক্ত হয় ।

প্রশ্ন

আবার, আপনি কি একটি উদাহরণের সঙ্গে এইটি ব্যাখ্যা করতে পারেন?

একটি শিশুর স্বাধীনতাকে বিবেচনা করুন । যেহেতু সে পড়াশুনা করে নি, সে একজন ডাক্তার হতে পারবে না । অতএব অস্ত্রোপচারের জন্য তার কোন স্বাধীনতা নেই । কিন্তু যদি সে পড়াশোনা করতো এবং একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হয়ে উঠতো, তখন সে অস্ত্রোপচার করার স্বাধীনতা লাভ করতো । এই স্বাধীনতা তার নিজস্ব পছন্দ । কিন্তু মানুষের তৈরি বিধানগুলির বিপরীতে, যেখানে একজন ব্যাক্তি নির্দিষ্ট বছরের পরে ডাক্তার হতে পারে না,

ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি আত্মা নিজেকে রুপান্তরিত করতে এবং প্রতি মুহূর্তে কার্যকর পরম সুখকর অবস্থায় পৌঁছানোর সুযোগ অর্জন করে।

এই সকল পছন্দগুলোর ক্রমসঞ্চিত মিশ্রণ (cumulative) যেটি আমরা অনাদি কাল থেকে এই মুহুর্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুহুর্তে বিভিন্ন জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনুশীলন করছি সেটিই আমাদের বর্তমান 'কর্মের ফলগুলিকে' নির্ধারণ করে।

এই 'কর্মের ফলগুলো' এমনই যে তারা সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফল যা সবচেয়ে অনুকূল এবং দ্রুততম পদ্ধতিতে পূর্ণ সুখ অর্জন করতে পারে। ঈশ্বর এই বিভাগের অপ্টিমাইজেশান বিভাগ পরিচালনা করেন বা 'কর্মের ফল' নির্ধারণ করেন এবং আত্মার এটার উপর (ফল নির্ধারনের উপর)কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

এখন 'কর্মফল' এমন একটি শব্দ যা 'সীমার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র' এর সমগ্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা আমরা সময়ের যে কোনও বিন্দুতে আনন্দ এবং বেদনার অনুভুতির সাথে পাশাপাশি অধিকার করি। এগুলি এক এবং একই ধরনের বিষয় থেকে উদ্ভুত হয় যাকে আমরা 'সংস্কার' বা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বলে থাকি।

সুতরাং, খুব সহজ অর্থে: "আত্মা কাজ করতে স্বাধীন কিন্তু তার কর্মের ফলের জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

প্রশ্ন

ঈশ্বর যদি আত্মাকে সৃষ্টি না করতেন এবং একে কাজ করার সামর্থ্য না দিতেন তাহলে আত্মা কোনো কিছু করতে পারত না। অতএব, একমাত্র ঈশ্বরই আত্মাকে নির্দেশ করেন।

আবার, একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নটি শুধুমাত্র ঐসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাসঙ্গিক যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আত্মাকে সৃষ্টি করেন।

বেদ অনুযায়ী, আত্মা কখনও তৈরি হয় না বা ধ্বংস হয় না। ঈশ্বর যেমন শাশ্বত, তেমনি আত্মাও তাই। বস্তুগত জগতের মূল কারণ 'প্রকৃতি' হল তৃতীয় শাশ্বত বিষয়। ঈশ্বর আত্মা ও প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন না।

এমন কোন সময় ছিল না যখন এই তিনটি শাশ্বত বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না এবং (ভবিষ্যতে) কখনই তার অস্তিত্বের অবসান ঘটবে না।

ঈশ্বরের ভূমিকা হলো সচেতন আত্মার সঙ্গে প্রাণহীন বা জড় প্রকৃতির সাথে এমন একটা পদ্ধতিতে একীভুত করা যাতে আত্মা কর্ম সম্পাদন করতে, পছন্দগুলোকে অনুশীলন করতে এবং শাশ্বত আনন্দে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এভাবে, ঈশ্বর একজন ইঞ্জিনিয়ার যিনি

'বিদ্যমান' বস্তুকে নকশা করেন এবং কাজ করেন, তিনি এমন কোন স্রষ্টা নন যে তিনি সত্য সাঁই বাবার মতো বা আল্লাহ এর মত শূন্য থেকে ললিপপ ও লেমন চুস তৈরি করেন।

প্রকৃতি এবং আত্মাকে একত্রিত করার পর, তিনি পূর্বে আলোচ্য শুভ আশাবাদের গানিতিক পদ্ধতি (optimization algorithm) অনুযায়ী আত্মার কাছে মন ও দেহের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেন। এখন এটি হলো আত্মা যেটি কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং তাই 'কর্মফলের' মুখোমুখি হয়।

যখন কেউ অন্যকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে, তখন খুনীকে শাস্তি প্রদান করা হয়, কিন্তু তলোয়ার প্রস্তুতকারীদের, তলোয়ার বিক্রেতাদের বা খনিশ্রমিক যে মাটি হতে লোহাকে নিষ্কাষন করে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয় না, কারণ শুধুমাত্র খুনীই এই অপরাধের জন্য দায়ী। অনুরূপভাবে, ঈশ্বর 'কর্মফলের' মুখোমুখি হন না, বা আত্মার ভালো বা খারাপ কাজের জন্য দায়ী হতে পারেন না।

যদি ঈশ্বর আত্মাকে কাজ করতে বাধ্য করতেন, তবে কেউই পাপ করত না কারণ ঈশ্বর পাপের উর্দ্ধে এবং পবিত্রতম। এটাই মর্যাদাপূর্ণ ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে ঘটে, যারা অজ্ঞতার সব বীজ পুড়িয়ে দেয়, এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা অনুযায়ী কাজ করে এবং তারপর পরিত্রাণ অর্জন করে।

প্রশ্ন

আত্মার বৈশিষ্ট্য কি ?

আত্মা এবং ঈশ্বর উভয় সচেতন (চেতন) এবং বিশুদ্ধ। উভয়ই অমর, অজাত এবং অনমনীয়।

কিন্তু মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপক, মহাবিশ্বের ধ্বংসকারী, অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি, অসীম সুখ ইত্যাদির মত অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের রয়েছে, যেটা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ন্যায়সূত্র অনুযায়ী আত্মার বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত হয়ঃ

. কোন কিছু অর্জন করার ইচ্ছা

. কোন কিছু থেকে অপছন্দ (দ্বেষ)

. চেষ্টা করার ইচ্ছা (প্রযত্ন)

. সুখ অনুভব করা

. দুঃখ অনুভব করা

. জ্ঞান আছে

বৈশেশিক সূত্র ৩/২/৪ অনুসারে যখন আত্মা মরণশীল শরীরে থাকে তখন আত্মার বিস্তারিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

. শ্বাস গ্রহন

. শ্বাস ত্যাগ

. সংকোচন

. শিথিলকরন

. মন এবং আত্মবোধ

. চলাচল

. ইন্দ্রিয় এবং কাজ করার অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ

. রূপান্তর।

আত্মা যখন একটি শরীরের মধ্যে থাকে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভাসিত হয়। যখন এটি শরীর ছেড়ে যায়, এই বৈশিষ্ট্যগুলো আর উপস্থিত থাকে না। এই সকল বিষয়গুলো হতে জ্ঞানীগন আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করেন।

প্রশ্ন

আত্মার আকার কি ? এটা কি সারা শরীরকে পূর্ণ করে ?

আত্মা মহাশূণ্যের মাঝে একটি বিন্দুর মত। আত্মা বিন্দুর মত এবং জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর আত্মার চেয়েও সুক্ষ্ম এবং অসীম জ্ঞানসম্পন্ন।

এভাবেই, ঈশ্বর শরীরের সম্পূর্ণ কার্য পরিচালনা করেন এবং আত্মা অফিসের CEO এর মত নিয়ন্ত্রণ করে।

কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে একটি হাতির আত্মা একটি পিঁপড়া আত্মার চেয়ে বড়। এটা সত্য নয়। সকল আত্মা তাদের সম্ভাব্যতা এবং মাত্রায় সম্পূর্ণ সমান। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল তাদের কর্মের ফল, যা তারা মুখোমুখি হয় তাদের বিভিন্ন কর্মের দ্বারা।

সুতরাং আত্মা আকার পরিবর্তন করে না যখন এটি (মৃত্যুর পর) এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে গমন করে। শুধুমাত্র তার নিয়ন্ত্রণের স্থান পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন

তাহলে আপনি বলছেন যে ঈশ্বর আত্মার ভিতরে এবং বাইরে উভয়েই ? কিন্তু অন্য বস্তুটি কিভাবে থাকতে পারে যেখানে একটি বস্তু ইতিমধ্যে বিদ্যমান ? অতএব, আত্মা যেখানে বিদ্যমান সেখানে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকতে পারে না। তারা একে অপরের কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আত্মার মধ্যে হতে পারে না।

দুইটি জিনিস তখনই একই স্থানে বিদ্যমান থাকতে পারে না, কেবলমাত্র যখন তারা একই মাত্রার ন্যায় আকারের থাকে। কিন্তু ঠিক যেভাবে লোহার মধ্যে সুক্ষ্মভাবে বিদ্যুতের উপস্থিতি থাকে, একইভাবে ঈশ্বর প্রতিটি আত্মার মধ্যে বাস করেন এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের প্রত্যেকটি স্থানে বাস করেন। অতএব ঈশ্বর এবং আত্মার সম্পর্কটা হলো পরিব্যাপ্তকারী-পরিব্যাপ্তের শিকার, শাসক-শাসিত, পিতামাতা-সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কিত।

প্রশ্ন

আত্মা এবং ঈশ্বর কি কখনও এক হিসাবে একত্রিত হয়, নাকি সবসময় পৃথক থাকে ?

আত্মা এবং ঈশ্বর কখনও পৃথক হয় না। কারণ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মার ভিতরে এবং বাইরে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং, আত্মা কখনোই ইশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হতে পারে না।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে আত্মা কখনো ঈশ্বরে পরিণত হয়। যদি তাই হতো, তাহলে এমনটা ইতিমধ্যেই ঘটে যেত। সর্বোপরি, আত্মা এবং ঈশ্বর অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান।

যাইহোক, যখন আত্মা অজ্ঞতার সমস্ত বীজ পুড়িয়ে দেয়, তখন এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সাথে সুসংগতভাবে কাজ করে। এখন এইরকম পরিস্থিতিতে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর আলোকিত হয়ে উঠে ঠিক যেভাবে যেভাবে বড় অগ্নিকুন্ডে একটি উত্তপ্ত লোহার টুকরা আগুনের একটি বল হয়ে ওঠে। এটি পরম সুখকর বা মুক্তির অবস্থা।

প্রশ্ন

আমি বুঝতে পেরেছি আত্মা কি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি। কিন্তু এই জীবনে আমার কি করতে হবে ? জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

এই জীবনের উদ্দেশ্য হল সঠিক কর্মের মাধ্যমে পরম সুখ বা মুক্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন

কীভাবে আমি সঠিক কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি ?

সঠিক কর্ম হচ্ছে ধর্ম অনুসারী কর্ম । ধর্ম আর religion এক নয় । ধর্ম মানে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য । উদাহরণস্বরূপ, দগ্ধ করা আগুনের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম এবং সিক্ত করা জলের ধর্ম । একইভাবে, আত্মার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে । যাইহোক, অজ্ঞতার কারণে, এই অনুভুতি এবং ধর্ম অনুসারে কর্ম করা আমাদের মধ্যে ম্লান হয়ে গেছে । কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন, দেখবেন ভিতরের কণ্ঠস্বর সবসময় আপনাকে নির্দেশনা দিয়ে থাকে । যখন আপনি ঐ ভেতরের কন্ঠস্বর অনুসরণ শুরু করেন, বাকি সবগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক পথে চলে আসে।

আপনি খুজে পাবেন যে, জালিয়াতি করা, নিষ্ঠুর হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া, দেশপ্রেমিক না হওয়া, এবং অলস হওয়া এবং আরো অনেক কিছু আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে । যখন আমরা স্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে শুরু করি, আমরা আরো বেশি সহজাত হতে তাড়না অনুভব করি- সুশৃঙ্খল হতে, প্রচেষ্টা করতে, সহানুভূতিশীল হতে, সত্যবাদী হতে, দেশপ্রেমিক হতে, বেদের জ্ঞান অনুসন্ধান করতে, সে আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে এবং পরম সুখের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে (তাড়না অনুভব করি) । এই সবই স্বাভাবিক ধর্ম । এতে এক জীবন লাগতে পারে, দুই জীবন বা বিভিন্ন জীবন লাগতে পারে, এবং ঈশ্বর নিশ্চিত করেন যে যাত্রাটি কখনোই ভাঙবে না।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বৈদিক জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বজ্ঞানমূলক (intuitive)।

ঈশ্বরের ন্যায় এই জ্ঞান ইতিমধ্যে আপনার মধ্যে আছে । অতএব, অন্ধ বিশ্বাস সম্প্পূর্ণরূপে প্রশ্নের বাইরে (অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না) । এমনকি এটা বেদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য । যাইহোক, বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি কমিউনিস্টদের দ্বারা দেখানো সংশয়বাদ এবং অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা এবং সবকিছুকে সন্দেহ করাও পশ্চাতবৃত্তির (অগ্রগতির বিপরীত) একটি ব্যবস্থাপত্র (recipe)।

এমন সব দলগুলি যারা ভয় বা প্রলোভনের মাধ্যমে কোন বইয়ের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস দাবী করে, ঈশ্বর প্রেরিত দূত, স্বর্গদূত, স্বর্গ এবং নরকে অন্ধ বিশ্বাস দাবী করে, তারা নিশ্চিতভাবেই আপনাকে ভুল কাজগুলি অনুসরণ করার দাবী জানাচ্ছে । তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন !

সৃষ্টির ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর নাকি অন্য কেউ ?

ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন ঠিক যেভাবে একজন প্রকৌশলী যন্ত্র তৈরি করেন। এইভাবে তিনি বিশ্বের 'ইঞ্জিনিয়ার'। কিন্তু একজন প্রকৌশলীর মতো, তিনি বিদ্যমান থাকা 'কাঁচামাল' বা প্রকৃতি (প্রায় বস্তু/শক্তি) ব্যবহার করেন জগত সৃষ্টির জন্য।

প্রশ্ন

মহাবিস্ফোরন বা বিগ-ব্যাং (তত্বের) এর কি হবে ? এটি বলছে সবকিছু একটি মহাবিস্ফোরন দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হচ্ছে।

সৃষ্টির ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে মহাবিস্ফোরন তত্বটিও একটি। এমনকি যদি বিগ ব্যাং সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে অবশেষে মাধ্যাকর্ষণ হ্রাস পাবে এবং ধ্বংসের প্রক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে। এবং তারপর মহাসংকোচন ঘটবে। এবং যখন সংকোচন ঘটবে, আবার বিগ ব্যাং ঘটবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে।

এইভাবে, যদি মহাবিস্ফোরন বা বিগ ব্যাং সত্য হয়, তহলেও সৃষ্টি এবং ধ্বংস চক্রাকারে ঘটবে এবং এটিও একটি এককালীন প্রক্রিয়া নয়।

প্রশ্ন

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ?

এই বিষয়টিকে মূল্যায়নের মাধ্যমে ধারনা করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের এই চমৎকার শরীর আছে, এক কথায় বিস্ময়কর বাস্তুতন্ত্র (eco-system), এবং আমাদের জীবনকে ধারনের জন্য এত ভালো একটা পরিবেশ। এবং আমরা জানি যে এটি সৃষ্টি করতে কিছুই করেনি। সুতরাং, এই সকল সৃষ্টি আমাদের জন্য করা হয়েছে এবং কোন বিষয়ের মত আমাদের ধারন করছে। আপনি যতই শারীরিক, পরিবেশগত, জৈবিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবেন ততই আপনি এই বিষয়টিকে প্রশংসা করবেন।

এইটি একটি সূত্র দেয় যে, সমগ্র সৃষ্টি আমাদের সাহায্য করছে কিছু উপায়ে বা নানা উপায়ে।

আরো অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে, আমাদের (আত্মার) কিছু করার ক্ষমতা সীমিত । আমদের অধিকতর সুখ লাভ করতে হলে, আমাদের সেগুলো অর্জন করার জন্য পদ্ধতির প্রয়োজন । মন এবং শরীরের মত শারীরিক সত্তা ছাড়া এটি সম্ভব নয় । তাই ঈশ্বর এই সৃষ্টিকে তৈরী করেছেন আমাদেরকে অধিক হতে অধিকতর সুখ প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য, আমাদের প্রতি পথসমূহ প্রদান করেছেন যাতে আমরা সেই পথে প্রচেষ্টা চালাতে পারি । সৃষ্টি ছাড়া, আমরা স্রেফ অচল হয়ে পড়ে থাকতাম।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি প্রকৃতিও তৈরি করেননি ?

না, মূল প্রকৃতি বা 'প্রকৃতি সৃষ্টির কাঁচামাল' ঈশ্বরের ন্যায় শাশ্বত (অর্থাৎ যার শুরুও নেই এবং শেষও নেই) । শাশ্বত হওয়ায়, ঈশ্বর বা প্রকৃতির সূচনা বিন্দু হওয়ার বা ধ্বংস হওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন

ঈশ্বর এবং প্রকৃতি ছাড়া শাশ্বত আর কি ?

নিজে ধারনা করুন ! আপনি এটা খুব ভালভাবে জানেন, কারণ এটি ঠিক সেটিই, যেটা সব সময় আপনার সাথে থাকে।

এটা 'আপনি' নিজে !

তৃতীয় শ্বাশত সত্তাটি হলো আত্মা বা জীব।

প্রশ্ন

তিনটি শাশ্বত বিষয়ের ব্যাপারে বেদ থেকে প্রমাণ কি ?

এটা সবচেয়ে অর্ন্তজ্ঞানলব্ধ বিষয় এবং যুক্তিপূর্ণ । আপনি নিজেকে জানেন যে, আপনি (আত্মা) অস্তিত্বমান । আপনি এও জানেন আপনার চারপাশে বিদ্যমান এই অস্তিত্বমান অচেতন বিশ্ব আপনি না । এর মধ্যে রয়েছে পদার্থ এবং শক্তি, এই দুটোই সংরক্ষিত থাকে এবং শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল গঠনে (মূল প্রকৃতি) । এবং আপনি জানেন যে, আপনার থেকে পৃথক একটি সত্তা (ঈশ্বর) দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে । তাই তিনটি শাশ্বত সত্তার এই ধারণা (চলুন এটিকে ট্রিনিটি বলি) সবচেয়ে মৌলিক এবং আমাদের সকলের দ্বারা অর্ন্তনিহীতভাবে পরিচিত । অন্যান্য তত্ত্বগুলি আমাদের প্রতি দাবী করে সতর্ক অনুমান করতে এবং জ্ঞাত তথ্যাদির বিচারের মাধ্যমে অজ্ঞাত বিষয়ের মূল্যয়নের করতে।

বেদে প্রচুর সংখ্যক মন্ত্র রয়েছে যা এই ত্রিত্বের কথা আলোচনা করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সকল মন্ত্রগুলোই ত্রিত্বকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে - তারা ঈশ্বরকে পূজা করে, আত্মাকে সম্বোধন করে এবং পথ নির্দেশ করে অথবা প্রকৃতির কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রার্থনা করে।

এখানে দুটি মন্ত্র আছে যা এই বিষয়ের উপর আরো বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়ঃ

ঋগ্বেদ ১/১৬৪/২০

দুই চেতন সত্ত্বা ঈশ্বর এবং আত্মা একসঙ্গে বন্ধুর মতো সবসময় রয়েছেন। একইভাবে, অন্য সত্তাটি (মূল প্রকৃতি) শাখাযুক্ত একটি বৃক্ষ হিসাবে বিদ্যমান। জীবন্ত সত্তাগুলির মধ্যে আত্মাটি শাখার ফলগুলোর স্বাদ গ্রহন করে। অন্য সত্তা ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে এসব থেকে দূরে থাকেন এবং তাই কখনও পার্থিব বিষয়ে আবিষ্ট হন না।

এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে এই তিনটি হলো শাশ্বত সত্তা। এটি আরো দেখায় যে ঈশ্বর কখনো মানুষ বা অবতার হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন না কারণ এটি তাকে প্রকৃতির ফাঁদে ফেলবে।

যজুর্বেদ ৪০/৮

ঈশ্বর তার শাশ্বত প্রজা আত্মাকে তাঁর জ্ঞান প্রদান করেছেন যাতে তারা (আত্মাগন) সর্বোত্তম সম্ভাব্য পদ্ধতিতে জগতকে (মূল প্রকৃতিকে) ব্যবহার করতে পারে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/৫

প্রকৃতি, আত্মা, এবং ঈশ্বর চিরন্তন। জগতের পরম উৎস বা কারণ হলেন তারা, এবং এই তিনটি কারণের (প্রকৃতি, আত্মা, এবং ঈশ্বরের) কোন কারণ নেই। প্রকৃতিতে জড়িত হয়ে আত্মা ফাঁদে পতিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর কখনও ফাঁদে পড়েন না এবং কখনও জড়িত হন না।

প্রশ্ন

মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রক্রিয়া উল্লেখ আছে এমন কিছু বৈদিক মন্ত্র আপনি কি প্রদান করতে পারেন?

ঋগ্বেদ ১০/১২৯/৭

হে মানব! ঈশ্বর বারংবার মহাবিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংস করেন। তিনি মহাবিশ্বের মালিক; তিনি সর্বত্র উপস্থিত, এবং তিনি বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করেন। শুধুমাত্র তাঁকেই উপাসনা করা যায় এবং অন্য কাউকে নয়।

ঋগবেদ ১০/১২৯/৩

এই সৃষ্টির আগে, সবকিছুই রাতের মত অন্ধকারে ছিল, এবং কিছুই বোধগম্য ছিল না। বস্তু / শক্তি বা মূল প্রকৃতি তার আদিম বা প্রাথমিক রূপে ছিল এবং ঈশ্বরের অসীম বিস্তারের তুলনায় একটি বিন্দুতে সীমিত ছিলো। তারপর ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন আকস্মিক বেগ যা প্রকৃতিকে বিসৃত জগতে রূপান্তরিত করে যা আমরা তাঁর অসীম শক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করি।

ঋগ্বেদ ১০/১২১/১

সমস্ত মহাজাগতিক গঠনের ভিত্তি যেগুলো আলোকিত হয় এবং সমস্ত আকাশমণ্ডলীয় গঠন যেগুলি আমরা দেখি সকলের এক এবং একমাত্র প্রভু হলো প্রিয় ঈশ্বর। এমনকি জগত অস্তিত্বশীল হওয়ার আগে তিনি অস্তিত্বমান ছিলেন এবং তারপর তিনি সূর্য, পৃথিবী এবং অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা যেন কেবলমাত্র সেই দয়াশীল ঈশ্বরেই আত্মসমর্পণ করি ও তাঁর উপাসনা করি এবং অন্য কারো প্রতি না করি।

যজুর্বেদ ৩১/২

একমাত্র তিনি নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ পুরুষ (জীবন্ত সত্তা), তিনি অমর এবং সব আত্মার এবং প্রকৃতির অভিভাবক। তিনি জড় (জীবনহীন) প্রকৃতি থেকে ভিন্ন একই সাথে জীবাত্মাসমূহ থেকে ভিন্ন। একমাত্র তিনিই জগত সৃষ্টি করেছেন এবং জগত সৃষ্টি করবেন অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। ধন্যবাদ ঈশ্বর!

প্রশ্ন

প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি ?

বিস্তৃতভাবে বললে, মৌলিক প্রকৃতি এক এবং সমান। সৃষ্টির শুরু হওয়ার আগেই এটা এমন ছিলো। তারপর ঈশ্বর তাকে আলাদা করেন নিম্নলিখিত ভাবেঃ

. সত্ব - পবিত্রতা বা জ্ঞানের পরিচায়ক।

. রজঃ - কর্মের পরিচায়ক।

. তমঃ - অকর্মন্যতার পরিচায়ক।

সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এগুলো আত্মার উপর প্রভাবকে নির্দেশ করে। এই তিনটি এইভাবে অস্তিত্বমান জগতের সুক্ষ্ম উপাদান গঠন করে। সমস্ত বস্তু, আবেগ, তথ্য, ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় এই তিনটির বিভিন্ন মিশ্রন দ্বারা। যখন আমরা ঘুমে থাকি, তমঃ অধিকতর প্রাধান্য লাভ

করে। যখন আমরা কর্ম অন্বেষন করি, রাগ ইত্যাদি করি, রজঃ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। এবং যখন আমরা শান্ত থাকি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষনের প্রক্রিয়ায় থাকি, তখন আমরা সত্ব দ্বারা প্রভাবিত থাকি।

এই উপাদানগুলি বুদ্ধি, অহংবোধ, মন, ইন্দ্রিয়গ্রন্থি, কর্ম অঙ্গ, পাঁচটি উপাদান যথা আগুন, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ তৈরি করে। এই সকলগুলো তারপর যথাযথভাবে আত্মার সাথে একীভুত হয় জগতকে সৃষ্টি করার জন্য যে জগতে আমরা দেখি, শুনি, অনুভূতি প্রাপ্ত হই, চিন্তা করি, মূল্যায়ন করি, ধারনা করি এবং সে অনুসারে কাজ করি।

একজন কল্যানকামী এবং বিচ্ছিন্ন প্রকৌশলীর ন্যায় ঈশ্বর এই সকল থেকে আলাদা থাকেন।

প্রশ্ন

সৃষ্টি করার জন্য কি কি জিনিস দরকার পরে ?

সৃষ্টির জন্য তিনটি জিনিস দরকার রয়েছে।

ক্রিয়াশীল কারন বা নিমিত্ত কারন - যার কার্যকলাপ কিছু তৈরী করে এবং যার নিষ্ক্রিয়তা কিছু তৈরী করে না।

বস্তুগত কারন বা সাধারন কারন - সেই 'কাঁচামাল' যেটা ছাড়া কোনো কিছুই তৈরি করা যায় না - মূল প্রকৃতি।

উপাদান কারন বা সৃষ্টিতে সাহায্যকারী উপকরনসমূহ।

নিমিত্ত কারনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

প্রধান কার্যকরী কারণ বা প্রকৌশলী বা প্রধান স্থপতি, যিনি সৃষ্টি করেন, পরিচালনা করেন এবং ধ্বংস করেন, যেমনঃ ঈশ্বর।

ক্ষুদ্র কার্যকারী কারণ বা সৃষ্টির ব্যবহারকারী, যেমন আত্মা। এটি ছাড়া, সৃষ্টিটি উদ্দেশ্যবিহীন।

বস্তুগত কারন বা প্রকৃতি জড় এবং তাই এটি স্বয়ং পরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে অক্ষম। এ জন্য এর একজন সংগঠক বা কার্যকর কারণ প্রয়োজন।

উপাদান কারনে সময় এবং স্থান (time and space) অন্তর্ভুক্ত।

এটা যেকোন সৃষ্টির জন্য সত্য যেটা ঈশ্বর দ্বারা বা আমাদের দ্বারা পৃথিবীতে ঘটে থাকে।

প্রশ্ন

যে উপায়ে একটি মাকড়সা নিজের ভিতরে থাকা বস্তু দিয়ে জাল তৈরি করে; ঈশ্বর কি নিজের থেকে এই বিশ্বকে তৈরী করতে পারেন না ?

প্রদত্ত উদাহরণটিতে ঈশ্বর কি করেন তা যথাযথভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু উপসংহারটি ভুল।

মাকড়সা জাল তৈরির জন্য তার শরীরটি ব্যবহার করে। জাল তৈরির উপাদান ইতিমধ্যে তার শরীরের মধ্যে উপস্থিত আছে। যদি তার শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে জাল তৈরি করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে, ঈশ্বর মূল প্রকৃতি থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করেন যা ইতিমধ্যেই ইশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

প্রশ্ন

কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি কি নিজে থেকে বিশ্বকে তৈরী করতে পারেন না ? এই জগত স্বয়ং ঈশ্বরের একটি মায়াময় রূপ হতে পারে।

সর্বশক্তিমান বলতে এটা বোঝায় না যে, ঈশ্বর যে কোন কিছু করবেন। তিনি শুধুমাত্র সেটিই করেন যা তাঁর করা উচিত, এবং তিনি তা করতে পারেন কারো সহায়তা ছাড়া। এমনকি আপনিও যে কোনো কিছু করতে পারেন, কিন্তু শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান প্রমান করতে আপনি কি আপনার কাপড় ছিঁড়বেন এবং কাঁদা খাবেন ? এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে পাগল বলা হয় এবং পাগলা গারদে আশ্রয় দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে, ঈশ্বর সবচেয়ে বুদ্ধিমান তিনি শুধুমাত্র উত্তম কাজটি করেন।

ঈশ্বর বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করেন। তাই ঈশ্বর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন না। এটি তার বৈশিষ্ট্য বিরুদ্ধ।

যদি জগৎ ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হতো, তবে এটি অবশ্যই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করত। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি কাদামাটির একটি মূর্তি নির্মাণ করি, তবে মূর্তিটি কাদামাটির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। কিন্তু বিশ্বজগত জড় এবং ঈশ্বর চেতন। বিশ্বজগত মূক, এবং ঈশ্বর পরম বুদ্ধিমান। ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; বিশ্বের বস্তুসমূহ মহাশূণ্যে সীমিত। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়; পার্থিব বস্তুগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে।

এভাবে, ঈশ্বর আত্মার কল্যানের জন্য জগতকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর জন্য শ্বাশত মূল প্রকৃতি ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন

বিশ্ব সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

আমি ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি যে ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা (আত্মা) প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করতে পারি, এবং সুখ অর্জন করতে চেষ্টা করতে পারি । কিন্তু আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করা যাক: জগত সৃষ্টি না করলে সেক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য কি হতে পারত ?

প্রশ্ন

তিনি যদি বিশ্ব সৃষ্টি না করতেন, তিনি আনন্দে থাকতে পারতেন। এমনকি আত্মা বেদনার ঝামেলা জটিলতা থেকে এবং আনন্দ থেকে দূরে থাকতে পারত।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তারাই ধারন করে যারা অলস অথবা যারা তাদের কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় না । যারা প্রচেষ্টা করে এবং অধিকার করার সাহস রাখে এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নয় । বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি সর্বোত্তম প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করেন ।

জগতে ব্যথার তুলনায় সুখ অনেকগুন বেশি । যদি তা না হতো, সবাই আত্মহত্যা করতে আগ্রহী হত। কিন্তু শুধুমাত্র মানসিকভাবে বিশৃঙ্খল লোকেরাই আত্মহত্যা করে এবং বাকীরা তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য অনেক দূরব্যাপী স্থানে চলে যায় । এইটি প্রমাণ করে যে জীবন তাদের কাছে প্রিয়, এবং তারা জীবনকে সবচেয়ে উপভোগ করেন।

ঈশ্বর অলস নয় বরং সবচেয়ে সক্রিয় । এ ছাড়া তার করুনা, যত্ন, জ্ঞান, সর্বব্যাপীত্ব প্রভৃতির মত গুণাবলিগুলো অর্থহীন হয়ে পড়তো যদি পৃথিবী তৈরি না হতো । এভাবেই ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্বকে তুলে ধরেছেন বিশ্বজগত বা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা এবং ধ্বংসের মাধ্যমে । আমাদেরও উচিত ঐ সকল কর্মের মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্বকে প্রতিপাদন (justify) করা যে কর্ম পরিত্রাণ বা পরম সুখ অর্জন করার মাধ্যমে (ঈশ্বরের) সৃষ্টিকার্যে আমাদের ভুমিকাকে প্রতিপাদন করে ।

ঠিক যেভাবে চোখ দেখার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে কিন্তু জগত মধ্যে কোনকিছু না দেখলে তা অদরকারী হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর কর্তৃক চক্রাকারে পরিচালিত জগতের সৃষ্টি, রক্ষনাবেক্ষন ও ধ্বংস ছাড়া ঈশ্বর, আত্মা ও মূল প্রকৃতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলিও অদরকারী হয়ে পড়বে । সুতরাং, সৃষ্টিকার্য হলো ঈশ্বরের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য । এবং আমাদের উচিত আমাদের নিজস্ব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা !

প্রশ্ন

তা হলে ঈশ্বর তার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য সৃষ্টি করেন, হুম ' এর অর্থ হলো ঈশ্বরের নিজস্ব এজেন্ডা আছে।

ঈশ্বর তাঁর বৈশিষ্ট্য নয় এমন কিছু করেন না । স্বার্থপরতা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয় তাই তিনি স্বার্থপর হতে পারেন না । আত্মার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে । আত্মা সচেতন এবং অস্তিত্বমান কিন্তু সুখরহিত । শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা আত্মা সুখ অর্জন করতে পারে ।

ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি না করেন, তবে আত্মা কর্ম সম্পাদন করতে পারে না, যাতে করে তার সুখ বৃদ্ধি হয় । এইভাবে ঈশ্বর মহাবিশ্বের সাথে আত্মাকে এমন একটি পদ্ধতিতে সংবদ্ধ করে যে, কর্মফল সকল সময়ের জন্য যথাযথভাবে ধারন করে । এখন আত্মা, তার কর্ম অনুসারে, তার সুখ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারেন।

এটি একটি মাইক্রোপ্রসেসরের মত যেটা কাজ করতে পারে শুধুমাত্র যখন এটিকে একটি শক্তি উৎস এবং মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয় । একইভাবে ঈশ্বর এই কম্পিউটার সিস্টেম তথা মহাবিশ্ব তৈরি করেন যাতে মাইক্রোপ্রসেসর তথা আত্মা সুখ অর্জনের জন্য তার কার্য সম্পাদন করতে পারে ও এর শক্তি প্রকাশ করতে পারে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল সমস্ত আত্মার জন্য সুখ প্রদান করা।

প্রশ্ন

যদি এইটি ঘটনা হয়, তাহলে কেন ঈশ্বর আরও সৃষ্টি বন্ধ করেন না এবং চিরকালের জন্য সকল আত্মাকে পরম সুখ দান করেন না ?

এই প্রশ্নটির উত্তর ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে । কিন্তু আমাকে আরো কিছু বিষয় আলোচনা করতে দিন ।

যদি ঈশ্বর এখন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বন্ধ করেন, তাহলে তিনি কিভাবে আত্মার কর্মের যথাযথ ফল প্রদান করতে সক্ষম হবেন, যে কর্মফল তারা আগের সৃষ্টি হতে এখন পর্যন্ত বহন করে আসছে ?

সুতরাং যদি ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেন, এটা তাঁকে ন্যায়বিরুদ্ধ করবে । কিছু আত্মা অন্য আত্মাদের তুলনায় যথাযথ প্রচেষ্টা ছাড়া পরিত্রাণ অর্জন করবে।

যেহেতু বৈদিক ব্যবস্থায় এককালীন সৃষ্টির পর কোন স্থায়ী জাহান্নাম বা স্বর্গ নেই, এটা (সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বন্ধ করাটা) ঈশ্বরের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য 'ন্যায়বিচারের অপরিবর্তনীয়তা'

বৈশিষ্ট্যের জন্য উপহাস তৈরী করবে। ঈশ্বর এর শাসন সম্পূর্ণ যোগ্যতাভিত্তিক এবং এখানে কোন ভর্তুকি বা ছাড় বা শর্টকাট নেই। এই সকল দলগুলো যারা এই ধরনের বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে লোভ দেখানোর চেষ্টা করে, তারা আসলে ভুল পথে চালনা করে এবং জ্ঞানীদের দ্বারা অবিলম্বে তাদের প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন

ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, কেন তিনি তবে অন্য মূল কারণ (আত্মা এবং প্রকৃতি) তৈরি করতে পারেন না ?

আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি, সর্বশক্তিমান অর্থ এটা বোঝায় না যে ঈশ্বর একজন পাগল মত কাজ করবেন। এছাড়াও, এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর নিজেকে হত্যা করতে পারেন এবং আরেকটি ঈশ্বর তৈরি করতে পারেন, নিজে জড় বস্তুতে পরিণত হতে পারেন, অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠেন, চিৎকার করে বা ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করেন, যুদ্ধ করেন বা অপরাধী হন ইত্যাদি। সবচেয়ে বুদ্ধিমান হওয়ায় ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাজ করেন এবং তিনি তা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পদ্ধতিতে করেন কারণ 'পরিপূর্ণতা' গুনটিও আরেকটি ধর্ম বা ঈশ্বরীয় বৈশিষ্ট্য। এবং তিনি তাঁর কর্ম অন্য কারো সাহায্য ছাড়া সম্পাদন করতে পারেন। এই তার সর্বশক্তিপরায়ণতা।

তাই ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি তৈরি করেন না। তারা ইতিমধ্যে বিদ্যমান। তিনি একসঙ্গে তাদের পরিচালনা করেন যাতে, আত্মার সর্বোত্তম স্বার্থ পরিবেশন করা যায়। এছাড়াও, যেহেতু ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ নিখুঁত তিনি কখনই নতুন কিছু তৈরি করার জন্য একটি নতুন চিন্তা বা নতুন ধারণা আনেন না কারণ সার্বিকভাবে বুদ্ধিমান ঈশ্বরের জন্য নতুন বলে কিছু নেই। অন্য কথায়, ঈশ্বর বিকশিত হন না কিন্তু সব সময় নিখুঁত থাকেন।

কিছু দলগোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে, হঠাৎ করেই আল্লাহর একটি নতুন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও ধারণা আসে, এই তত্বটি পরোক্ষভাবে বোঝায় যে তিনি হঠাৎ শূণ্য থেকে আবির্ভুত হয়েছেন। এই ধারণাগুলো ইশ্বরের জন্য বিরাট অপমান, যিনি সর্বদা নিখুঁত। অন্য কথায়, যদি ঈশ্বর কিছু করেন, তার মানে তিনি সর্বদা তা করবেন এবং সর্বদা এটি করেছেন।

এছাড়াও, যারা মনে করে যে ঈশ্বর আত্মার সৃষ্টি করেন, তারা আসলে ঈশ্বরকে একটি মানসিক বিকারগ্রস্থ নাটকীয় প্রেমিকের মধ্যে রূপান্তরিত করেন, যে নিজেকে খুশি করতে এমন অনর্থক কাজগুলি করেন। অধিকন্তু, যদি এটি ঘটেও থাকে তবে সমগ্র সৃষ্টি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনতায় পরিণত হয় কারণ তিনি হয়তো আগামীকাল একই ভাবে আত্মাকেও ধ্বংস করার ইচ্ছা করতে পারেন।

সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র এটি বোঝায় যখন আত্মা এবং প্রকৃতি তার সাথে থাকে, সবসময় এবং তখনই তিনি আত্মাকে সাহায্য করেন।

শুধু এটা ভাবুন। দয়ালু হওয়া একটি ভাল গুন। কিন্তু যদি বিশ্বে কোন মানুষ না থাকে, তাহলে আপনি কার প্রতি দয়া করবেন ? এখন ধরুন একদিনের জন্য আপনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা হলো। আপনার উদারতা দেখানোর জন্য, আপনি কি একটি পুতুল তৈরি করবেন এবং তারপর এটির প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন ? প্রকৃতপক্ষে, শিশুরা তাই করে। কিন্তু যদি আপনি একজন পরিনত ব্যক্তি হিসাবে এটি করেন, মানুষ আপনার জন্য মানসিক চিকিৎসার সুপারিশ করবে। তাই বিবেচনা করুন সবচেয়ে বুদ্ধিমান সত্তা ঈশ্বরের কি এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হতে পারে ?

এইটি ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দলগোষ্ঠীর জন্য একটি বিরাট (তাত্বিক) ফাঁক।

প্রশ্ন

শারিরীক আকৃতিসম্পন্ন মানুষের সন্তানদেরও একটি শারিরীক আকার আছে। যদি তারা নিরাকার হত, তাহলে তাদের সন্তানদেরও নিরাকার হতে হবে। যেহেতু আমাদের আকার আছে, তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরেরও একটি আকার আছে।

তিনি বিশ্বের 'ইঞ্জিনিয়ার' কিন্তু বিশ্বের 'কাঁচা মাল' না।

আলফ্রেড নোবেল ডায়নামাইট তৈরী করেছেন; তার মানে এই নয় যে তিনি ডায়নামাইটের মত দেখতে!

বিশ্বের জন্য 'কাঁচামাল' হলো মূল প্রকৃতি, এবং এই মূল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, এটি আকৃতি সম্পন্ন। তাই, বিশ্বের আকৃতি আছে (কারন এই বিশ্ব মূল প্রকৃতি হতে সৃষ্ট)।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি কারণ ছাড়া কাজ করতে পারেন না ?

না, কারণ যিনি অস্তিত্বমান নেই তিনি হঠাৎ অস্তিত্বমান হতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে যে আমি একজন বন্ধ্যা মহিলার এক সন্তানের বিয়ে দেখেছি, আপনি বলবেন যে আমি পাগল। কারণ যদি তার একটি শিশু থাকে তবে সে বন্ধ্যা হতে পারে না এবং যদি সে বন্ধ্যা হয়, তবে তার কোন সন্তান থাকতে পারে না। একইভাবে, কারণ ছাড়া, কোনও কর্ম বা প্রভাব ঘটতে পারে না। প্রতিটি প্রভাবের একটি কারণ থাকতে হবে।

যদি কেউ বলেন যে, আমি অস্তিত্বমান নই, কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি ! বাগানে কোন ফুল ছিল না, কিন্তু ফুলের মালা ছিল সুন্দর ! আমি কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতা দিতে পারি ! এই ধরনের কথাবার্তা অর্থহীন !

প্রশ্ন

যদি সবকিছুর একটি কারণ থাকে, তাহলে কারণের কারণটি কি (what is the cause of the cause)?

সংখ্যার দর্শন ১/৬৭ বলে: "মূল কারণটির আর কোন কারণ হতে পারে না।" এ কারণে এটিকে শ্বাশত কারণ বলা হয় ।

সুতরাং, তিনটি সত্ত্বা সৃষ্টিকর্তা, কাঁচামাল, আনুষাঙ্গিক উপকরন এবং উদ্দেশ্য কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। একই ভাবে জগত সৃষ্টির ব্যাপারেও এটা সত্য এবং তাই ঈশ্বর, আত্মা ও মূল প্রকৃতি এই তিনটি সৃষ্টির শাশ্বত মূল কারণ।

প্রশ্ন

এই সকলকিছু শূন্য থেকে শুরু হয় এবং শেষ পরিণামে শূন্যে শেষ হয় । যাকিছুই অস্তিত্বমান হোক না কেন শুরু হয় শূন্য থেকে এবং সবশেষে শূন্যে পরিনত হয় ।

এছাড়াও শূন্য বলতে একটি বিন্দুকেও বোঝানো হয় । যদি এই অর্থটি নেওয়া হয় তবে এটি সঠিক । কারণ যখন সমগ্র বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এবং সে অবস্থা থেকে প্রাথমিক গঠনের দিকে ফিরে আসে, এটি একটি বিন্দুই হয় ।

কিন্তু যদি শূন্য মানে কিছুই নেই অবস্থা বোঝায় তাহলে, এই অর্থটি ভুল । কারণ শূন্য হলো জড় এবং জীবনহীন । শূন্য বা জিরো হতে চেতনা কীভাবে আসতে পারে ?

তাছাড়াও, যিনি শূন্যকে জানেন এমন কিছু শূন্য বা 'কিছুই নেই' এমনটা হতে পারে না ।

সুতরাং, যারা এই ধরনের অকার্যকর যুক্তি প্রদান করে মূলত তারা বর্তমান বাস্তবতা থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন, এই কথাটি অস্বীকার করা যাবে না । এমনকি এক্সট্রাপোলেশন (জ্ঞাত তথ্যাদির বিচারের মাধ্যমে অজ্ঞাত কিছুর মূল্য বিচার করা) হতে পারে এমন ঘটনাগুলির জন্য যেটি অস্তিত্বমান আছে । কিন্তু এ ধরনের বাতিল-প্রেমীরা যেটা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান তা অস্বীকার করে এবং তারপরই কেবল তাদের কল্পনা থেকে এক্সট্রাপোলেট করে ।

যদি আমরা ইতিহাসের দিকে নজর দিই তাহলে দেখি যে, বাস্তবতা থেকে মুখ লুকিয়ে থাকার এই অস্ট্রিচ পাখির মত আচরন আমাদের সমাজ ও বিশ্বকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এইটি সমাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার দিকে আমাদের ধাবিত করেছে।

যখন আক্রমণকারীরা ভারত আক্রমণ করছিল, তখন এই ধরনের মতাদর্শের বিশ্বাসীরা জাতিকে প্রতিরক্ষা করতে অস্বীকার করেছিলো, এই চিন্তার মাধ্যমে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো যে, 'এই সকলই শূন্য, এবং তাই তাদের কোন কর্তব্য নেই।' 'শূণ্যবাদ' পলায়নপর এবং অলস ব্যক্তিদের জন্য একটি নিশ্চিত রেসিপি বা ব্যবস্থাপত্র। নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিগন যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করে।

প্রশ্ন

কোনকিছু অনস্তিত্বমান অবস্থা থেকেও আসতে পারে। যেমন, বীজে কোনো গাছ থাকে না। কিন্তু জল দিলে পরে, বীজ থেকে গাছ আসে।

যা কিছু বীজ থেকে বেরিয়ে আসে সেটা আগে থেকেই বীজের মধ্যে ছিল। জল, আলো ইত্যাদির সাথে ক্রিয়া করার পরই এটি শুধুমাত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি অনস্তিত্বমান কোনো কিছু থেকে বেরিয়ে আসে না। যারা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছে তারা জানবে যে বস্তু শক্তি সংরক্ষিত এবং অস্তিত্বহীন কিছু থেকে কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং এই যুক্তিটি ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক।

প্রশ্ন

কিছুই স্থায়ী নয়। সবকিছু অস্থায়ী। যা কিছু অস্তিত্বমান তা ধ্বংস হবে। অতএব, আত্মা, ঈশ্বর, মূল প্রকৃতিও শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবে।

সবকিছুই যদি অস্থায়ী হয়, তাহলেতো ধ্বংসও অস্থায়ী হতে হবে। যদি যা কিছুই বিদ্যমান তা ধ্বংস হয়, তাহলে এমনকি এই ধ্বংসেরও উচিত ধ্বংস হওয়া।

বাস্তবে, শারীরিক সত্ত্বার শুধুমাত্র গঠনটাই পরিবর্তিত হয়। কোনো কিছুই, না তৈরি হয়, না ধ্বংস হয়। যারা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন তারা এইটি ভালভাবে বুঝতে পারেন।

প্রশ্ন

সৃষ্টির কোন স্রষ্টা নেই। বস্তুর যথেচ্ছ বা এলোমেলো সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা ঘটেছে।

যদি সৃষ্টিকার্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে, তাহলে ধ্বংস কিভাবে ঘটে ? এবং যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টি কিভাবে ঘটে ? যদি উভয়ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে থাকে, তবে সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্র এবং সুসমন্বিত পরিকল্পনা কীভাবে পরিচালিত হয় ?

যদি আপনি বলেন যে, যখন সুনির্দিষ্ট শর্ত বিদ্যমান, তখন সৃষ্টি হয় এবং যখন অন্যান্য নির্দিষ্ট শর্ত বিদ্যমান, তখন ধ্বংস হয়, তারপর আপনি স্বীকার করেন যে বাহ্যিক বেশ কিছু শর্ত আছে যেটা সৃষ্টি বা ধ্বংস ঘটায়। এইভাবে, আপনি ভিন্ন ভাষায় স্বীকার করেন যে, যখন সৃষ্টি বা ধ্বংস ঘটে তখন কোনোকিছু শর্তগুলোকে পরিচালিত করে। অন্য কথায়, আপনি সম্মত হন যে কেউ না কেউ এই বিধানসমূহের বা সৃষ্টি ও ধ্বংসের শর্তসমূহের পরিচালনা নিশ্চিত করে। এইটিকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি। তাই আপনি ভিন্ন ভাষায় একই জিনিস বলছেন কারণ যেকোন কারনে ঈশ্বর শব্দের ব্যবহারে আপনার 'অ্যালার্জি' আছে।

একটি সাধারন সাইকেল তৈরি করতে, আপনাকে শত শত উপাদান তৈরির পরিকল্পনা করতে হয়, আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন, তারপর সাইকেলের পরিকল্পনা এবং ডিজাইন করেন। সুতরাং যখন আমরা বলি, এমন একটি জটিল এবং অত্যন্ত নিখুঁত বিশ্ব যা আমরা দেখি তার পিছনে একটি মহান পরিকল্পনা আছে, তাতে আপত্তিটা কোথায় ?

আপনি কি এমন এক উদাহরণ উদ্ধৃত করতে পারেন যেখানে কারো দ্বারা সৃষ্ট না হয়েই কোন কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হয়েছে ?

ঈশ্বরের পথপ্রদর্শন ছাড়া জড় পরমানুগুলোর জানার উপায় নেই যে তাদেরকে এমনভাবে এই সকল জায়গাতে একত্রিত হতে হবে, রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি প্রবর্তন করতে হবে, সমন্বিত হতে হবে এবং তারপরই শরীরের একটি সাধারন অঙ্গ 'হাত' এর মত জটিল কিছু তৈরি হবে। মানুষের মস্তিষ্কের মত মেশিনগুলির কথা ভুলে যান যার কাজ এখনো সব বোঝা যায় নি ! এবং তারপরও আমরা দাবি করি এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেছে ! এইটি শিশুসুলভ কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছুই না।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি প্রতিবার একই জগত সৃষ্টি করেছেন বা কিছু বৈচিত্র রেখে সৃষ্টি করেছেন ?

ঋগবেদ ১০/১৯০/৩

ঈশ্বর আগের সৃষ্টিতে একই ধরনের সূর্য, চাঁদ, মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ অন্যান্য বস্তুসমূহ এবং বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন।

এটি সংশয়াতীত। যেহেতু ঈশ্বর সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং তাই সৃষ্টি একটি সম্পূর্ণ শুভ ইতিবাচক প্রক্রিয়া, সকল চক্রের জন্য একমাত্র সর্বোত্তম সৃষ্টি, এবং এটিই হলো সেইটি ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের কোন শেখার কিছু নেই কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সবকিছু জানেন।

যাইহোক, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র রয়েছে কারণ বিভিন্ন আত্মাগুলির ভিন্ন ভিন্ন অতীতের কর্মের বোঝা বা সংস্কার বা প্রবৃত্তি রয়েছে যেটা তাদের কর্ম করার স্বাধীনতার বিভিন্ন মাত্রার কারন। সুতরাং, একই ইতিহাস প্রতিবার পুনরাবৃত্তি হয় না।

প্রশ্ন

কিন্তু কেন এত বড় একটি মহাবিশ্ব সেই সাথে এত এত খালি স্থান এবং কোটি কোটি মহাকাশীয় বস্তু রয়েছে এমন একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর জন্য ? এই সকল তারকারাজি এবং গ্রহের ব্যবহার কি ?

এইগুলো আমাদের দৃষ্টিকোণে বিরাট কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিকোনে নয়। এছাড়াও, পৃথিবী একমাত্র জায়গা নয় যেখানে জীবন আছে। অগণিত পৃথিবী আছে এই মহাবিশ্বে এবং আত্মারা মধ্যে তাদের কর্মের বিচারে একটি থেকে অন্যটিতে যাচ্ছে।

জীবন-রক্ষার জন্য এবং সৃষ্টি-রক্ষণাবেক্ষণ-ধ্বংসের জন্য এই সকল তারকারাজি, সূর্য, ইত্যাদির প্রয়োজন। এ কারণেই তাদেরকে বলা হয় 'বসু' বা যে সত্তাগুলো আত্মার টিকে থাকার জন্য অবলম্বন সহায়তা প্রদান করে। এই মহাবিশ্বের কোন কিছুই ফেলনা নয়।

প্রশ্ন

ঈশ্বর যদি আত্মা ও মূল প্রকৃতি তৈরি না করে থাকেন এবং আত্মা ও মূল প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের সাথে একই সাথে অবস্থিত হয়ে থাকে তবে কেন তিনি তাদের নিয়ন্ত্রন করেন ? তাঁর তাদের উপর কোন অধিকার থাকা উচিত নয়। এটা কি তাদের ব্যক্তিগত অধিকারের একটি সীমালংঘন না ?

সহ অস্তিত্বমান থাকা অর্থ এটা বোঝায় না যে, ঈশ্বরের তাদের নিয়ন্ত্রন করা উচিত না। শাসক এবং প্রজার সহাবস্থান এমনকি এই জগতেই বিদ্যমান। এর মানে কি শাসকের তাদের শাসন করা উচিত নয় ? অথবা আপনি কি আপনার উপকারের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে অস্বীকার করবেন একারনে যে, এটি আপনার জন্মের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল ?

এই আপত্তিটি আসতে পারত যদি ইশ্বর কেবলমাত্র বাইবেলের ঈশ্বর বা কুরআনের আল্লাহ্ এর মতই অন্যায় আচরণ করতেন, যিনি ক্রোধপ্রবন, রাগান্বিত, ভয় জাগানিয়া, অলসতা ও খেয়ালখুশিমত চলেন।

যখন শাসক সবচেয়ে নিখুঁত হয়, এবং তিনি প্রজাদের কল্যানকে নিশ্চিত করেন আরো যথাযথ উপায়ে, এবং প্রজাদের শাসন করার কোন সামর্থ্য নেই, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন বোকা একটি শান্তিপূর্ণ দেশকে সোমালিয়া বা আফগানিস্তানে পরিনত করতে পছন্দ করবে।

কিন্তু ঈশ্বরের ধর্মরাজ্যে, প্রজা বা আত্মাগন তাদের ইচ্ছামত যা করতে চায়, তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এবং যেকোনো গুনতন্ত্রমতে, তারা তাদের কর্মের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পুরস্কার বা শাস্তি পায়, কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব কল্যানের জন্য । কিন্তু বিপরীতে মানুষের শাসনে যেখানে একজনকে তার পুরষ্কারের জন্য ঘোষনার অপেক্ষা করতে হয়, ঈশ্বর একটা চলমান প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষনিক ন্যায় বিচার করেন । এছাড়াও, মানুষের শাসনে, যদি কেউ অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে এবং অপরাধের যিনি শিকার হয়েছেন তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে কিছুটা সময় লাগে । এটা ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দলগুলির জন্যও সত্য, যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ বা ঈশ্বর স্রেফ আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন নিঃশব্দ অলস শ্রোতাদের মতো এবং তারপর এই পৃথিবীকে চিরতরে ধ্বংস করার পরই ন্যায়বিচার করবেন আমাদেরকে তিন-তারকা বিশিষ্ট জান্নাত বা নরকে পাঠিয়ে দিয়ে। ঈশ্বর এর শাসনে, কোন ক্ষতিপূরণ নেই কারণ কেউই এরকমভাবে কারও ক্ষতি করতে পারে না । অধিকন্তু অপরাধ শুরুর মুহূর্ত থেকে সঠিকভাবে শাস্তি দেয়া শুরু হয় । একইভাবে পুরষ্কৃত করার বেলায়ও এমনটা হয়।

একমাত্র বোকারা ঈশ্বরের এমন একটি ন্যায় ও দয়াপরায়ণ ও সমৃদ্ধ এবং মেধাপূর্ণ রাজ্যে বাস করে দুঃখ প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন

আপনি কি সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রক্রিয়ার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারেন ?

বেদ অনুযায়ী,

সৃষ্টির আগে সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিলো । সব আত্মা (যারা মুক্তি বা পরিত্রাণ অর্জন করেছেন তারা ছাড়া) অচেতন ছিলো।

এরপর ঈশ্বর ইক্ষন সম্পন্ন করেন বা প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত করেন। এটি (ইক্ষন বা প্ররোচনাই) আদি প্রকৃতির প্রাথমিক গঠন থেকে আরও অধিকতর স্থুল কিছু পরিবর্তনের কারন ।

ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বস্তুর ন্যায় স্থুল গঠনগুলি সৃষ্টি হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে মন, অহং, অনুভূতি, কর্ম প্রবৃত্তিসমূহ, গ্রহ, তারকা, গ্যালাক্সী ইত্যাদি । এই সকলগুলো ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় বিধান অনুযায়ী ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে ।

একবার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এবং আত্মার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলো তৈরি হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৃথিবীতে আত্মাকে (পূর্বের সৃষ্টি চক্রের কর্ম অনুসারে) বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্ম দেয়া হয়।

অবশেষে, মানব প্রজাতির জন্ম দেওয়া হয়। বিভিন্ন মানুষ বেদ অনুসারে দুইটি লিঙ্গেই জন্ম নেয় এবং ভুলভাবে বিশ্বাস করা একমাত্র আদম-ইভে নয় । তাদের ভিন্ন ভিন্ন জেনেটিক গঠন রয়েছে এবং এভাবে তারা নিজেদের মধ্যে বিয়ে করতে পারে। সুতরাং, মানব সভ্যতার শুরুতে ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ বা ব্যাভিচার প্রবর্তন করার জন্য আল্লাহ বা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি না ।

সবচেয়ে মর্যাদাবান মানুষদেরকে বেদ জ্ঞান দান করা হয়।

তারা তখন অন্যান্য মানুষকে বৈদিক জ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেয় এবং এভাবে সভ্যতার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

কর্মের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন পরিবেশে আত্মা বিভিন্ন প্রজাতির, বিভিন্ন পৃথিবীতে জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করে ।

যে আত্মারা একটি অজ্ঞতা হতে মুক্তি পায়, তারা প্রাথমিক স্তর সীমা অতিক্রম করে তাদের আর জন্ম নেয়ার প্রয়োজন হয় না কারণ তাদের জন্মের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তারা মুক্তি বা মোক্ষ বা পরিত্রান অর্জন করেন এবং দীর্ঘসময়ের জন্য অবিরাম ঈশ্বরের পরমসুখ উপভোগ করেন কয়েকটি সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্রে ।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয় এবং ধ্বংসের ধাপের দিকে আরো অগ্রসর হয়।

অবশেষে, ধ্বংসের প্রক্রিয়াটি ঘটে। এই পর্যায়ে আত্মা চেতনাহীন থাকে। ধ্বংসের পর্যায়টি কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকে যা শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন বা মুক্ত আত্মারা যারা পরিত্রাণ লাভ করেছেন তারা জানেন।

নতুন সৃষ্টি শুরু হয় । আবার একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয় । এবং আত্মাগন সৃষ্টির শেষ চক্রের কর্মের ফল অনুযায়ী জন্ম নেয়। প্রক্রিয়াটি এই ভাবেই চলমান।

এই সৃষ্টি এবং ধ্বংস ধারাবাহিকভাবে দিন এবং রাতের মতো হয়ে আসছে অনাদি কাল হতে এবং চিরতরে চলতে থাকবে। এটি শাশ্বত।

{৫}

কর্মের ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

কর্মতত্ত্ব কি ?

সহজভাবে, কর্ম তত্ত্ব বলে যে

. আপনার চিন্তাগুলো বাস্তব হয়ে যায়।

. বিপরীতভাবে, আপনার বর্তমান বাস্তবতাটি হল, ঐ দিন পর্যন্ত যা কিছু ভাবনাসমূহ আপনি চিন্তা করতে সিদ্ধান্ত নেন এর ক্রমসঞ্চিত প্রকাশ। সচেতনভাবে চিন্তা এবং অবচেতনভাবে চিন্তা, উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত।

এই বাস্তবতাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠে সুখ অর্জন করতে আপনাকে সহায়তা করা। এবং আপনার চিন্তাধারার পরিবর্তন করে আপনি আপনার বাস্তবতা পরিবর্তন করে উচ্চতর আনন্দের দিকে যেতে পারেন। সুতরাং, জীবন একটি অপরিকল্পিত বিশৃঙ্খল রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়। জীবন এবং চারপাশের পৃথিবী একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যেটা আপনাকে সুখের দিকে পরিচালিত করে। এবং এই সিস্টেমটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার উপায় হলো চিন্তাধারাকে সুখ অর্জনের দিকে চালিত করা।

প্রশ্ন

তার মানে একমাত্র সুখই কি জীবনের লক্ষ্য ?

ঠিক তাই ! জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল সুখ বা আনন্দ অর্জন করা। এবং এটি অর্জন করার উপায়টি হলো সঠিকভাবে জীবন ব্যবস্থাকে বুঝতে পারা এবং এই প্রক্রিয়ার সর্বাধিক অনুকূল ব্যবহারের জন্য আমাদের চিন্তাকে চালিত করা।

প্রশ্ন

ঐ সকল ব্যাক্তিদের ব্যাপারে কি হবে যারা অন্যের জন্য নিজের সুখকে বিসর্জন দেয় ? তারা তাদের সুখকে বিসর্জন দেয় না । তারা শুধুমাত্র সুখের উচ্চ স্তর লাভের জন্য তাদের স্বল্পমেয়াদি সুবিধা বিসর্জন দেয় ।

স্বার্থহীনতা থেকে প্রাপ্ত সন্তুষ্টি, ধনসম্পদ বা জাগতিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত সুখের ঊর্ধ্বে । আপনি আমাদের নিজেদের জীবনের সাথে এটি তুলনা করতে পারেন । শিশু হিসাবে, মাটি খাওয়ার মত অনেক কার্যক্রম আমরা উপভোগ করি । কিন্তু আমরা যখন বড় হই, তখন আমরা উচ্চতর স্তরের অনন্দ অনুসন্ধান করি এবং কখনোই এই আনন্দগুলোকে শিশুসুলভ আনন্দগুলোর সাথে বিনিময় করতে আগ্রহী হই না । যেহেতু আপনি বুঝতে পারবেন, জগতকে যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে তা হলো, একটি পুকুরে জলের বিভিন্ন অণুর মত আমরা সবাই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । আমরা জগতের সুখকে বর্ধিত করা ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র সুখ বর্ধিত করতে পারব না । সুতরাং, বুদ্ধিমান মানুষরা জগতের কল্যানের জন্য চিন্তা এবং কর্ম থেকে উদ্ভুত উচ্চ স্তরের সুখ অর্জনের জন্য তাদের স্বল্পমেয়াদি সুবিধাগুলোর চিন্তা বন্ধ করে ।

প্রশ্ন

চিন্তাধারাই কি সবকিছু ? কর্মের ব্যাপারটা কি ?

চিন্তাই সবকিছু না । কিন্তু এটা শুধুমাত্র (পরম সুখ অর্জনের দিকে যাত্রা) শুরুর প্রক্রিয়া এবং এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে । আমাদের কর্ম সহ অন্যান্য সবকিছু হলো প্রক্রিয়াটির পরবর্তী ধাপ, যেটা প্রতিটি চিন্তার সাথে শুরু হয় ।

আমরা যা করি এবং অর্জন করি সেগুলো মনের চিন্তার সাথেই শুরু হয় । এমনকি 'কর্মহীন চিন্তা' এধরনের চিন্তাও হলো একটি চিন্তা, যেটিকে আমরা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই সেটা আমাদেরকে কর্মতত্ত্ব অনুসারে ফলাফলের পরিনামের দিকে পরিচালিত করে । কর্ম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণটাও এক ধরনের চিন্তা (যার মাধ্যমে) আমরা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই । এবং যেহেতু আমরা বুঝতে পারি, যে চিন্তাগুলো চুড়ান্তভাবে কর্মে পৌছায় না, সাধারণত, সেগুলো আমাদেরকে পরম সুখের দিকে নিয়ে যায় না ।

সম্পূর্ণ কাঠামোর মধ্যে এই চিন্তার তিনটি দিক হাতে হাত ধরে একত্রে চলে, সেগুলো হলো জ্ঞান, কর্ম এবং গভীর চিন্তা । একটি চিন্তা প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ যেটা এই তিনটিকেই পরিবেষ্টন করে ।

প্রশ্ন

কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে, কি কি চিন্তা সুখের দিকে চালিত করে এবং কি কি চিন্তা করেনা ?

এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিভিন্ন উপায় আছে। কিন্তু মৌলিক নীতি হলো সত্য = সুখ।

আমাদের জীবনে দুটি পরিচালনা শক্তিকে বিবেচনা করুন, সে দুটি হলো জ্ঞান এবং অজ্ঞতা। জ্ঞান আমাদেরকে সত্যের দিকে চালিত করে এবং অজ্ঞতা সত্য থেকে দূরে চালিত করে। এবং তারা আমাদের সবচেয়ে মৌলিক চিন্তাধারা 'ইচ্ছাশক্তি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ইংরেজী ভাষায় এটিকে will এবং সংস্কৃত ভাষায় বলে সংকল্প। এই সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি আরও অধিকতর চিন্তার দিকে পরিচালিত করে সে অনুসারে কর্মে নিয়োজিত হয় এবং অবশেষে আমরা বাস্তব ফলাফলের মুখোমুখি হই।

যদি আমরা সত্যকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের ইচ্ছাকে পরিচালনা করে থাকি, তবে আমরা পরম সুখের কাছাকাছি চলে আসব, অন্যথায় পরম সুখ থেকে দূরে চলে যাব। বাকি উপায়গুলো স্রেফ 'সত্য = পরম সুখ' এই মৌলিক নীতির সম্প্রসারন।

প্রশ্ন

সত্য কোনটি সেটা আমরা কীভাবে নির্ধারন করব ?

বিভিন্ন উপায় আছে। মূলত এটি একটি ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি। সত্যের সিদ্ধান্তটি সমস্ত রকম অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করার দাবী রাখে এবং একই সাথে যখন আমরা নতুন তথ্য ও প্রকৃত ঘটনা জানতে পারি সে অনুসারে নিজের অবস্থানকে পরিবর্তন করার সরলতার দাবী রাখে। বর্ননা এবং স্বতন্ত্রতা পরিবর্তনের একটি নিখুঁততা এবং যখন আমরা ~ গঠন এবং ঘটনাগুলির মধ্যে নতুন হয়ে উঠি অপরিহার্য উপাদান আবার সত্য, একটি উইল বা সংকলপ সত্য গ্রহণ।

প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো সত্য গ্রহনের ইচ্ছা বা সংকল্প। বিবিধ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অর্ন্তভুক্তঃ

. বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া। CAT বা GMAT অর্জনে বুদ্ধিমান উচ্চাকাঙ্খীদের মতই, প্রত্যেকের উচিত অবিলম্বে যুক্তি এবং সত্যের উপর ভিত্তি করে, যেগুলো নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা এমনসব পছন্দগুলি অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান করা। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা জেনেছি যে পৃথিবী বৃত্তাকার, তখন 'পৃথিবী সমতল' এই অনুমানের (hypothesis) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সব তত্ত্ব, তথাকথিত ধর্মীয় বইসহ সবকিছুকেই বাতিল করা উচিত।

. একটি অনুমানের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্বের পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, একটি তত্ত্ব বলে ঈশ্বর ন্যায়বান। এবং তারপর এটি বলে যে তিনি অধিকতর নারীদেরকে নরকে রাখবেন। যেহেতু এই উভয় বিবৃতি একে অপরের বিপরীত এবং সেইজন্য, তারা অবিলম্বে প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

. অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ এবং যুক্তিবিচার।

. ঘটনার যাচাই।

এইটি নিজেই একটি বিজ্ঞান, এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং গভীর মনোযোগ প্রয়োজন। কিন্তু এটা বুঝার একটিমাত্র পূর্বশর্ত হল একটি সেটা হলো সত্য অন্বেষনের ইচ্ছা।

প্রশ্ন

কর্মতত্ত্ব কীভাবে কাজ করে?

এটি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে।

. মনের প্রতিটি চিন্তা, মনের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনার একটি নির্দিষ্ট ধরন উৎপন্ন করে।

. এর উপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয় যেমন হরমোনের মাত্রা, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি।

. উপরন্তু, এমনকি স্নায়বিক ধরন এই চিন্তাকে গ্রহন করতে শুরু করে। সুতরাং, যদি আপনি বারবার একই জিনিস চিন্তা করেন, স্নায়ুগুলো একটি প্যাটার্ন বা ধরন তৈরি করে যেটি পরবর্তীতে চিন্তার প্রক্রিয়াটিকে সহজে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ কারনেই আমরা মানুষের মধ্যকার ভাল বা খারাপ অভ্যাসগুলোকে দেখি। এই চিন্তাগুলো একেকজনের চিন্তাভাবনার রূপরেখাকে নির্ধারন করে, এবং তারপর তার ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য এবং কর্মকে নির্ধারন করে।

. প্রতিটি চিন্তা 'আমরা কে' সেটিকে প্রভাবিত করে। এবং এই চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি 'আমরা কে' হব।

. একই প্রক্রিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে ঘটছে। এবং আমাদের চিন্তার ধরনগুলির উপর ভিত্তি করে যখন আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি, আমরা অগনিত সামাজিক ধরন এবং আচরণ উৎপাদন করি, যেটা 'আমরা কে' এই বিষয়টিকে আরো প্রভাবিত করে।

. মানুষের এবং সমাজের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নয়, এই প্রভাবটি সাধারণভাবে প্রকৃতিতেও বিস্তৃত হয় কারণ প্রকৃতির সাথে ক্রমাগত বিষয় ও শক্তির বিনিময় করার জন্য আমাদেরকে

নকশা (design) করা হয়েছে।

. এভাবেই, আমরা দেখি যে কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা, কখনও কখনও, অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে ঘটে।

. চিন্তা আমাদের ভাগ্যে পরিনত হয়। আমরা অর্থাৎ আত্মা, আমাদের শরীর এবং মন থেকে ভিন্ন। এবং যখন আমরা মরে যাই, শরীর ও মন (ব্রেইন) প্রকৃতির সাথে বস্তুগত এবং শক্তির টেকসই বিনিময় বন্ধ করে দেয়, এবং সেইজন্য এই ব্যবস্থাটি মৃত্যুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মা, যে এই সিস্টেম নিয়ন্ত্রক ছিল, সে আক্রান্ত হয় না।

. মৃত্যুর পরে, আত্মা অন্য আরেকটি প্রণালীতে (মন শরীর) প্রবেশ করে এবং পুনরায় তার যাত্রা শুরু করে।

. কারণ স্মৃতিগুলি মস্তিষ্ক কোষের (ব্রেইনের) অংশ, এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা তার সাথে একটি অত্যাবশ্যক শরীর বহন করে, যা দিয়ে আত্মা সংস্কার (বৈশিষ্ট্য) বহন করে।

. ঈশ্বর নিশ্চিত করেন যে, নতুন দেয়া ব্যবস্থাটি যেন আত্মার সামনের দিকে অবিচ্ছিন্ন ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হয়।

. বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে, আত্মা পুনরায় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। এটি বাইরের জগতের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে ঠিক যেমনটা পূর্বে সে করেছিল এবং এভাবে নিজেকে ক্রমাগত বিকশিত করে।

প্রতিটি মুহুর্তে, ঈশ্বর নিশ্চিত করেন, জগতে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হই তা যেন আমাদের পরম সুখের অনুসরনের জন্য উপযুক্ত হয়। এটি একটি ক্রমাগত ইতিবাচক প্রক্রিয়া। যদি আমরা আমাদের ইচ্ছাকে বোকা অর্থহীন কাজ করাতে অনুশীলন করি, তাহলে অর্থহীন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং আমরা আনন্দহীনতার দিকে অধঃপতিত হব। সত্যের অনুসরণে আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে কাজে লাগাই, তাহলে আমরা উর্দ্ধগামী হব। এই প্রক্রিয়া মৃত্যুর দ্বারা অব্যাহত থাকে।

প্রশ্ন

প্রাণী এবং নিম্ন প্রজাতিদের কি হবে ? তারা কিভাবে তাদের ইচ্ছাকে চর্চা করতে পারেন ?

ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র মানুষেরই তাদের ইচ্ছাকে অনুশীলন করার সম্ভাবনা আছে। অন্য প্রজাতিগুলো তাদের সাথে যা হচ্ছে তা কেবল গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের ইচ্ছাকে অনুশীলন করতে পারে না।

যখন একটি আত্মা এতটাই নিম্নে অধঃপতিত হয় যে এটি আর মানুষের মত তার ইচ্ছার অনুশীলন করে না, তখন এটি প্রাণী হিসাবে জন্ম নেয় যেখানে এই প্রবণতাগুলি, যা সে সংগ্রহ করেছিলো সেগুলি মুছে ফেলতে পারে । একই ব্যাপার তাদের সাথেও ঘটে যারা জন্মগতভাবে উন্মাদ বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ হয় ।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি একটি বহু-মাত্রিক বিশ্ব । সুতরাং, চিন্তার রীতির উপর নির্ভর করে এই ভিন্ন মাত্রিক জগত এবং জীবনের দিকগুলির মধ্যে সম্ভাব্য সংমিশ্রণগুলি কার্যত অসীম । এটি একটি ধারাবাহিকতাহীন অসংলগ্ন প্রক্রিয়া নয় বরং সম্পূর্ণ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । এইভাবে, ভিন্ন প্রজাতিতে, অবস্থায়, স্বাস্থ্যে, সমাজে ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন্মের কারনে প্রতিটা আত্মার অবস্থায় ভিন্নতা আসে ।

প্রশ্ন

দুর্ঘটনা এবং ঘটনার ব্যাপারে কি হবে, যেগুলোর উপর আমাদের চিন্তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই ?

সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্লেষন করলে, এই ঘটনাগুলির বেশিরভাগের উপরই আমাদের যৌথ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । সুতরাং, সমষ্টিগতভাবে, আমরা সন্ত্রাসবাদ ও পরিবেশগত ক্ষতির জন্য দায়ী । এবং আমরা সকলেই এই ব্যাপারে কিছু করতে পারি এমনকি পৃথকভাবে হলেও ।

কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, 'আমরা প্রত্যেকে একক আলাদা ব্যক্তিত্ব' আমাদের এই অজুহাতে আমরা কখনোই নিজেকে কোন দায় থেকে মুক্তি দিতে পারব না । আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা যতদূর ছিলো সে অনুযায়ী আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি, এটা ছিলো আমাদের ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধির (সুখ অন্বেষক হিসাবে) জন্য সর্বোত্তম উপযুক্ত । সামাজিক দিক দিয়ে আমাদের ইচ্ছার অনুশীলন এতে অন্তর্ভুক্ত আছে । সুতরাং, আমরা যে ঘটনার সম্মুখীন হই সেটাও আমাদের কর্মের ফলাফল বা পরিনতি ।

আমরা এমন কিছু ঘটনার মুখোমুখি হই যেটাতে আমাদের কোন স্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই । সেগুলো আমাদের অতীতের কর্মফল থেকে আসে । কোনো ক্ষেত্রে, কোনো ঘটনাই সুখের সন্ধানে আমাদের যোগ্যতাকে কখনই ব্যাহত করে না । কর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ সাময়িক বিলম্ব হতে পারে । এমনকি এই বিলম্বের সময়টাকে অন্যান্য নির্দিষ্ট দিকের উপর যেগুলো হয়তবা আমরা বাদ দিয়ে গেছি সে দিকগুলোতে নিজেদের আরো অধিকতর উন্নত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

মনে রাখবেন, এটি বৈচিত্রময় দৃষ্টিভঙ্গী সংবলিত একটি বহুমাত্রিক বিশ্ব, এবং এটি গভীরভাবে দেখার যোগ্য ।

প্রশ্ন

কেন আমরা আমাদের অতীত জীবন মনে রাখি না ?

আমরা আমাদের অতীত জীবনের কথা মনে রাখি না, কারণ সাধারণভাবে এটি আমাদের লক্ষ্য পূরণে অপ্রয়োজনীয়।

মনে রাখবেন এটি একটি সম্পূর্ণ শুভবাচক বা ইতিবাচক প্রক্রিয়া যেখানে বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় কিছুর জন্য কোন সুযোগ নেই । যদি আমরা আমাদের অতীত জীবনকে স্মরণ করি, আমরা সম্মুখে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হব না। তাই, অতীত জীবনের কথা দূরে থাক, এমনকি এই জন্মেরও বেশিরভাগ ঘটনাই আমাদের মনে থাকে না।

এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, কেবল প্রাসঙ্গিক বিষয়টিই মনে রাখা হয়। যখন মানুষ এই নিয়মটি ভঙ্গ করে অতীতকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করে, তখন তারা নানাবিধ মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কারন খারাপ কিছুকে প্রশ্রয় দেয়া একটি অস্বাভাবিক কাজ।

আমরা বর্তমানে বাস করে এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে পরিচালনা করে সর্বাধিক আনন্দ জীবনে আহরন করি । এ কারণেই সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় অতীত এবং অপদেবতা বোঝাতে একটাই শব্দ 'ভূত' ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্ন

কেন আমরা অতীত জীবনের কাজের জন্য শাস্তি পাই যেটা আমরা এমনকি স্মরনও পারি না ?

আমরা সাধারণত যেমনটা বুঝে থাকি, কর্মতত্ত্বের মধ্যে তেমনভাবে শাস্তি এবং পুরষ্কারের কোন ধারণা নেই । সেখানে আছে শুধুমাত্র আত্মশোধনের একটি ক্রমাগত ইতিবাচক প্রক্রিয়া, যেটা সুখ বা আনন্দের সর্বোচ্চকরণের দিকে পরিচালিত হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস থেকে আলাদা (এই কর্মতত্ত্ব অনুসারে) হঠাৎ করে জীবনে একটি অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটে, এমনটা কখনোই হয় না । কর্মতত্ত্বের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা (discontinuation) নেই, (এটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া) । ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। এটা এক রাতে হঠাৎ করে ঘটবে না। বরং খারাপ জীবনধারা অভ্যাসের কারণে আমরা ডায়াবেটিসকে বৃদ্ধি করি । যখন মধ্য বয়সে উপসর্গ দেখা দেয়, তখন আমরা নিজেদেরকে ডায়াবেটিক বলে আখ্যায়িত করি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এটি একদিনে ঘটেনি । আমাদের সেদিন থেকেই সবসময় ডায়াবেটিকের মধ্যে ছিলাম প্রথমবার যেদিন ভাল স্বাস্থ্যাভ্যাসের বিপরীতে কিছু করেছিলাম। এবং যখন আমরা সুস্থ জীবন যাপন করি তখন

প্রতিটি মুহূর্ত, আমরা ডায়াবেটিস থেকে দূরে সরে যাই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা স্বাস্থ্য বিষয়কে উপেক্ষা করি, আমরা (ডায়াবেটিসের দিকে) এক ধাপ কাছে চলে আসি। রোগের চূড়ান্ত প্রকাশটি সমগ্র যাত্রার যৌথ প্রভাবকে চিত্রিত করে।

এখন, আমরা হয়তো এমনকি আমাদের ১% কর্মকেও স্মরণ করি না, যেগুলো আমাদের ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ডায়াবেটিকের দিকে যাই কারণ আমাদের প্রবণতাগুলি ছিলো ডায়াবেটিকের (অনুকুলে)।

একইভাবে, যদিও আমরা আমাদের অতীত জীবনকে মনে রাখি না, তবে আমাদের বর্তমান প্রবণতাগুলি আমাদের পুরো ইতিহাসের সমষ্টিগত সারসংক্ষেপ। নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই তথাকথিত শাস্তি যেগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে আসে বলে মনে হয়, সেগুলি আসলে সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় যেগুলো বর্তমানে দৃশ্যমান লক্ষনসমূহে আবির্ভূত হয়েছে।

আবার এটা থেকে বাহির হওয়ার উপায়টাও সহজ। আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া সংশোধন করুন। যখন আমরা আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়া সংশোধন করব এবং সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের ইচ্ছাকে ব্যবহার করা শিখতে শুরু করব, যে প্রবণতাগুলো বিষাদের কারন আমরা সেগুলো সঞ্চয় করা থামিয়ে দেব। এবং তারপর, এই তথাকথিত শাস্তি বন্ধ হবে।

প্রশ্ন

কেন ভাল মানুষদেরকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে তারা ভাল চিন্তাভাবনা এবং ভাল কাজ করে?

খুশি হলো মনের একটি অবস্থা। আমরা প্রায়শই 'দুর্ভাগ্য' বলে যা মনে করি সেটা আসলে স্বল্পকালীন অসুবিধা ছাড়া কিছু নয় সানন্দে সুখের উচ্চতর স্তরের জন্য যে কেউ এইসব চিন্তাভাবনা বন্ধ করবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন খেলাধুলা করি তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, আহত হই, ক্লান্ত হয়ে যাই, কিন্তু আমরা তারপরও খেলতে থাকি। কারণ এই আনন্দ যা আমরা পাই সেটা সামান্য ব্যাথার তুলনায় অনেক বেশি। আসলে, আমরা এই ব্যথা উপভোগ করি!

এই দুঃখগুলোর অনেকগুলোই অতীতের সঞ্চিত প্রবণতা কারণে হয়, যা এখন লক্ষণ দেখানো শুরু করেছে।

লম্বা সময় পরে অনুশীলন শুরু করতে যে সমস্যাগুলো হয় সেটার মত অন্যান্য অনেক (সমস্যাগুলো) দেখা দেয়। কয়েক দিনের জন্য এটি যন্ত্রণা দেয় কারন আমাদের সিস্টেম বা

প্রণালীটি হঠাৎ করে এই সুস্থ অভ্যাসটি গ্রহন করতে পারে না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে, ব্যথা দূর হয়ে যায়, এবং আমরা উপকার পেতে শুরু করি।

অন্য অনেকগুলো এমন সব প্রাকৃতিক সমস্যা, যা থেকে আমরা জীবনে পরিত্রাণ পেতে পারি না । এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করার একটি লক্ষ্য হলো এই সকল মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে কিভাবে উপেক্ষা করা যায়, এটা শিক্ষা করা।

কিছু দুর্বিপাকের কারণ হলো, এমনকি ভাল মানুষও সকল দিক দিয়ে ভাল নয় । যেমন, একজন ব্যাক্তি খুব সৎ হতে পারেন । কিন্তু তাঁর একটি শক্তিশালী শরীর নেই এবং জানেন না কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় । তিনি গুন্ডাদের দ্বারা নিহত হন কারণ তিনি দুর্বল ছিলেন। স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তার সঠিক ইচ্ছার অভাবের কারণে এটা হয়েছে। মনে রাখবেন, শক্তিশালীগন সত্য জ্ঞানের সহিত সমন্বয় করেন।

প্রশ্ন

কেন আমরা খারাপ লোককে এত শক্তিশালী হতে দেখি ?

উপরের কথাটির উল্টোটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য।

এই খারাপ মানুষ কখনোই ভিতরে ভিতরে শান্তিতে থাকে না । প্রকৃতি আমাদেরকে এমনভাবে নকশা করে নি যে আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতারক, অপরাধী বা কুটিল হওয়া মেনে নিতে পারি । এমনকি যদি আমরা লক্ষনগুলোকে উপেক্ষা করতে শিখি, এইগুলো খারাপ প্রভাবের কারণ হয়ে যায় । বস্তুগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, এই মানুষগুলি অসুখী হয়, আমরা জানি তারা সর্বদা অসুরক্ষিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, কাউকে বিশ্বাস করে না এবং মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়। খারাপ অভ্যাস বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বাস্থ্যকর খাবারের মতো।

বিশ্ব বহু-মাত্রিক। ভাল বা খারাপ কাউকে দেওয়ার জন্য কোন একক বিশেষণ নয় । কোন ব্যাক্তির জীবনের প্রায় সব দিকই খারাপ হতে পারে, কিন্তু তার প্রচুর আস্থা, আত্ম বিশ্বাস এবং দক্ষতা রয়েছে, যেগুলো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য । সেই অনুযায়ী, তিনি বস্তুগত বিষয় সহ জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে সফল হবেন কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার দুর্দশাগ্রস্থ হবেন।

প্রশ্ন

কর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য কি ?

কর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সকলেই সর্বোচ্চ স্তরের সুখ অর্জন করতে পারি । এটা সম্পূর্ণ যোগ্যতা ভিত্তিক ব্যাপার কোন পক্ষপাতিত্ব বা খামখেয়ালীপূর্ণ কোন কিছু নয় । আমরা যেমনটা ভাবি, তেমনটাই হই । এটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের চিন্তার পরিচালনা ও

তীব্রতার উপর নির্ভর করে। যদি আমরা জীবনকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি, তবে এই তত্ত্বটি কাজ করছে এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সংকেত খুঁজে পাব। এবং আমরা তখন অন্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করে আমাদের সুখ অর্জন করতে এটি ব্যবহার করতে পারব।

প্রশ্ন

জীবনের লক্ষ্য কি ?

আমি আগেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আমাকে পুনরায় বলতে দিন। জীবনের লক্ষ্য হলো এই কর্মতত্ত্ব ব্যবহার করে পরম সুখ লাভ করা।

প্রশ্ন

এমনকি সেক্স, মদ্যপান, ইন্দ্রিয়পরায়নতা এই সকল কি আমাদের সুখ দেয় ? কর্মের তত্ত্ব অনুযায়ী এটি সঠিক কি?

না, তারা সুখ দেয় না। উল্টো, এই ধরনের জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি অচল করে সুখের বিভ্রম তৈরি করে। এমন কোনোকিছু, যেটা চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র ব্যবহার না করেই আমাদেরকে কাজ করায়, সেটা আসলে দুঃখের জন্য একটি নিশ্চিত ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কিছু নয়।

আমাদের সুখ বৃদ্ধি পায় তখনই, শুধুমাত্র যখন সুখের উৎস বহিরাগত উৎসের উপর কম নির্ভরশীল হয়। এটা ঘটে শুধুমাত্র জ্ঞান সংগ্রহের মাধ্যমে এবং মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কর্মের মাধ্যমে।

এটিকে দর্শন করার আরেকটি উপায় হলো নিজেদের জিজ্ঞাসা করে, "এই কর্মের উদ্দেশ্য কী ?" যদি উত্তরটি হয় "শুধুমাত্র বিনোদন পাওয়া" বা "অভ্যাসের কারনে কর্ম করি" বা অন্য কোন অস্পষ্ট অজুহাত দেখানো হয়, তাহলে কর্মতত্ত্বের অনুসারে এটি সঠিক কর্ম নয়।

জীবনের লক্ষ্য হলো আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করে এই মিথ্যা অজুহাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা। যে কর্ম আমাদেরকে নির্বোধ করে দেয়, সেটা আসলে লক্ষ্যস্থলের উল্টোদিকে গাড়ির চালানোর মত ব্যাপার হয়।

প্রশ্ন

ঈশ্বর কি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন না, যদি আমরা আমাদের অন্যায় কাজের জন্য ক্ষমা চাই ?

আমরা ইতিমধ্যেই এই আলোচনা করেছি। কিন্তু আসুন এই বিষয়টা নিয়ে আরো আলোচনা করি।

আমাকে বলুন, বাস্তব জীবনে কি তা ঘটে ? অসতর্ক ড্রাইভিং এর কারণে দুর্ঘটনার পতিত হওয়ার পর আমরা কি 'দুঃখিত' শব্দটি উচ্চারন করলে সুস্থ হয়ে যাই ? যদি কেউ 'দুঃখিত' শব্দটি উচ্চারনের মাধ্যমে এত সহজে মুক্ত হয়ে যেতে পারে, তাহলে মানুষ অলস হয়ে যাবে এবং যখন অসুবিধা সামনে আসবে কেবল 'দুঃখিত' শব্দটি উচ্চারন করবে।

প্রকৃতি এবং তার আইন ঈশ্বরের ব্যবস্থার বস্তুগত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। এখানে প্রয়োগ করা নিয়মগুলি অন্যত্রও প্রয়োগ করা হয়। বৈদিক ভাষাতে এটিকে বলা হয়, "যৎ পিন্ডে, তৎ ব্রাহ্মান্ডে" মাইক্রো-সিস্টেমে বা ক্ষুদ্র প্রণালীতে যেভাবে ঘটে তা অন্যত্রও ঘটে। কর্মতত্ত্বে ক্ষমার কোন স্থান নেই। এখানে শুধুমাত্র উন্নতির সুযোগ আছে। এটা অনেকটা বছরের পর বছর অলস থাকার পরে ব্যায়াম শুরু করার মত। এটি প্রাথমিকভাবে ব্যথা দেবে। সিস্টেম এটিকে মানিয়ে নিতে সময় নেবে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যত বেশি হবে, আমরা তত ভালোভাবে সঠিক ছাঁচে আসব।

অপ্রত্যাশিতভাবে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু লক্ষ্যভেদী পারদর্শীতা সঠিক ইচ্ছাশক্তির সাথেই ঘটবে। প্রশ্ন

আমরা কিভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা শুরু করব, এটি বুঝতে কোনো কাঠামো আছে ?

এর জন্য প্রকৃতপক্ষে এই বৈদিক যোগ কাঠামো আছে। এই তথাকথিত শারিরীক কসরৎপূর্ণ ব্যায়াম এবং ভঙ্গিমা যা আপনি দেখে থাকেন এর সাথে বৈদিক যোগের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিটি মুহুর্তে নিজেকে দক্ষ করার এবং জীবন যাপনের শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যাপারে দক্ষ করার জন্য কর্মতত্ত্ব অনুসারে এটি (বৈদিক যোগ) একটি পদ্ধতি। এটি অত্যন্ত অর্ন্তজ্ঞানলব্দ এবং সুন্দর নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত, যে কেউ প্রশংসা করতে পারে। এটি একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু এটি একটি বাস্তবিক বিজ্ঞান এবং এর জন্য মার্শাল আর্ট বা শরীরচর্চার মত অনুশীলনের প্রয়োজন।

মনে রাখবেন, অন্যান্য শিল্পের চেয়ে আলাদা, এটি অভ্যন্তরীণকরণের একটি প্রক্রিয়া। কোন শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক আপনাকে পরম জ্ঞান প্রদান করতে সাহায্য করতে পারবেন না। তাঁরা নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন, এবং আপনার নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কর্মতত্ত্বের মধ্যে দায়-দায়িত্বের কোন স্থানান্তর নেই।

{৬}

মুক্তি বা পরিত্রানের ধারনার উপর প্রশ্ন

প্রশ্ন

মুক্তি/মোক্ষ বা স্যালভেশন কি ?

মুক্তি মানে স্বাধীনতা। মুক্তি মানে সমস্ত আত্মার স্বাধীনতার আকাঙ্খা। অন্য কথায়, মুক্তি মানে সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বাধীনতা।

প্রশ্ন

এই মুক্তির পরে কি হবে ?

এই স্বাধীনতা বা মুক্তির পর, আত্মা পরম আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং ঈশ্বরের এর অনুপ্রেরণার অধীন হয়ে বাঁচবে। এই যে কারো জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং উপভোগ্য অবস্থা। এছাড়াও অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিপরীতে খেয়াল করুন, মুক্তি অবস্থাটি ঘুম বা সুশপ্তি অবস্থার অনুরূপ নয়। এটা ঘুমের বিপরীত, বরং চেতনার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরের একটি অবস্থা।

প্রশ্ন

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই আছেন। তাই আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার অধীনে বাস করি। তাহলে মুক্তি ব্যাপারটির বিশেষত্ব কি ?

যদি আপনি ঈশ্বর ও আত্মার আলোচনার কথা মনে করতে পারেন, তাহলে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছতে পারি যে, আত্মার 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' এবং সীমিত জ্ঞান রয়েছে। এবং যখন আত্মা 'ইচ্ছার' সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করে, এটি আরো অধিকতর আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করে। এ কারণেই এটি সুপারিশ করা হয়, আত্মার উচিত যেকোনো উপায়েই হোক সৃষ্টিকর্তার অনুকরন করা এবং এছাড়াও এমনভাবে কাজ করা যেটা সৃষ্টির সার্বিক উদ্দেশ্যের সাথে সহযোগী।

জীবনের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে সক্ষম করা যাতে এই আত্মা এমন কর্ম পরিচালনা করতে পারে যেটা তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতে সহায়তা করে। যখন সাদৃশ্য অবস্থাটি এমন একটি অবস্থার দোরগোড়ার পর্যায়ে পৌঁছে, যেখানে কোন আত্মার জন্মগ্রহণ করার

জন্য অন্য কারণ থাকে না। এইভাবেই এটি জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের চক্র থেকে স্বাধীনতা পায় এবং পরমানন্দ অর্জন করে।

এভাবে, মুক্তি মানে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকল কর্ম পরিচালনা করা। ঈশ্বর সর্বদা আমাদের অনুপ্রেরণা দান করছেন এবং আমাদের চারপাশে আছেন এবং একই সাথে আমাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু যখন আমরা এইটি উপলব্ধি করি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করি, তখন আমরা মুক্তি লাভ করি।

প্রশ্ন

এই মুহুর্তে মুক্তি থেকে আমাদেরকে কী বাধা দিচ্ছে ? কেন ঈশ্বর এখনই আমাদেরকে মুক্তি দিচ্ছেন না ?

আমাকে আগে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে দিনঃ ঈশ্বর শুধুই সর্বোত্তমটাই করেন। তিনি ইচ্ছামত কাজ করেন না।

আমাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল এমন যে মুক্তি অর্জনের একমাত্র উপায় হল অজ্ঞতা দূর করা এবং এই অজ্ঞতা দূর করার একমাত্র উপায় হল কর্ম করা। আমাদের সঠিক কর্ম করার অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হল জন্ম গ্রহণ করা এবং একটি পরিবেশ অর্জন করা যেটা আমাদের বর্তমান সামর্থ্য অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত। এবং যতক্ষণ না আমরা দক্ষতা অর্জন করি এবং মুক্তি লাভ করি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর তা করতে থাকেন। তাই তিনি আমাদের জন্য সেরা সম্ভাব্য পদ্ধতিতে কাজ করেন, যাতে আমরা যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি লাভ করতে পারি।

এবার প্রথম প্রশ্নে আসি, আসুন আমরা আত্মার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ঈশ্বর এবং মূল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করি।

প্রকৃতি হলো সৎ, অর্থাৎ এটি অস্তিত্বমান।

আত্মা সৎ ও চিৎ, অর্থাৎ এটি অস্তিত্বমান, এবং এটি সচেতন (জীবিত, এবং প্রাণবিশিষ্ট, ইত্যাদি)

ঈশ্বর সৎ, চিৎ, এবং আনন্দময় অর্থাৎ তিনি বিদ্যমান, সচেতন এবং সেইসাথে আনন্দময়তার অধিকারী।

এখন আত্মা অর্ন্তনিহীতভাবে আনন্দ বা সুখ অধিকার করে না। এটিকে প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুখের দিকে যেতে হয়। যেহেতু ঈশ্বরের আনন্দময়তা আছে, এটি বোঝায় যে আত্মারও ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে।

এখন আসুন আমরা বৈদিক দর্শনের আরেকটি ভিত্তি, "জ্ঞান = সুখ" এই তত্ত্বে আসি।

যেহেতু ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান রয়েছে, তাই তার অসীম আনন্দ আছে।

কিন্তু আত্মার সীমিত সম্ভাবনা এবং সীমিত জ্ঞান আছে। এই সীমাবদ্ধতা ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত 'কর্মের আইন' অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

সুতরাং, আত্মার একমাত্র উপায় হল সঠিক কর্মের দ্বারা তার জ্ঞান বৃদ্ধি করা যেটা সীমাবদ্ধতাকে দূর করে দেয়।

প্রশ্ন

আপনি কি এই প্রক্রিয়াটিকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন ?

এই প্রক্রিয়ার কার্যপ্রণালী নিম্নরূপঃ

কর্ম সংস্কার (প্রবণতা বা অভ্যাস) তৈরি করে এবং সংস্কার আত্মার সম্ভাব্যতার সীমা নির্ধারণ করে। কৌশলটি হলো, আপনি যখনই কোনও একটি কর্মের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তখন এটি একটি সংস্কার তৈরি করে। সংস্কার বলতে বোঝায়, একই অবস্থায় একই কর্ম পরিচালনায় আপনার সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, আপনি যদি প্রতারণা, ঘৃণা প্রভৃতির মতো ভুল কাজ করেন, তাহলে আপনার এই রকম কাজ বারবার করার সম্ভাবনা বাড়বে। এটা আপনার সুপ্ত সম্ভাবনার সীমাকে হ্রাস করবে, অতএব আপনার জ্ঞান হ্রাস পাবে ফলশ্রুতিতে সুখ হ্রাস পাবে। এটাই আপনার মুক্তি থেকে দূরে সরে যাওয়ার পদক্ষেপ।

কিন্তু যখন আপনি সহানুভুতি, বিশ্লেষণ করে একমাত্র সত্যকে গ্রহন, উন্নত চরিত্র ইত্যাদির মতো ভালো কাজ করেন, আপনার মধ্যে এই ধরনের ভালো ভালো কাজ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এইটি আপনাকে জ্ঞান অনুসন্ধানের বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে চালিত করে এবং সেইজন্য সুখ বাড়ে। এভাবে আপনি মুক্তির দিকে পা বাড়াবেন।

এখন, প্রতিটি পদক্ষেপ (চিন্তা ও অনুভূতি সহ) এই প্রক্রিয়ায় গননা করা হয়। এছাড়াও, মনে রাখবেন যে এমনকি আপনি যদি কোনকিছু একবারও করেন, এটার পুনরায় ঘটার সম্ভাবনা বাড়বে এবং আপনাকে বুদ্ধিহীন বা বুদ্ধিমান করার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে।

একটি আদর্শ আত্মা প্রতি মুহূর্তে ভালো এবং মন্দ কাজে অন্দোলিত হয়, মাতালের মত কয়েক ধাপ পিছিয়ে যায় এবং কয়েক ধাপ আগায়, ফলশ্রুতিতে মুক্তি পেতে বিলম্ব হয়।

কিন্তু একজন যোগী খারাপ কর্ম না করতে এবং যথাযথভাবে উত্তম কর্ম পরিচালনা করতে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করেন । এটি ধীরে ধীরে পুরাতন খারাপ কর্মের সংস্কারগুলিকে দুর্বল করে দেয় এবং ভালো সংস্কার দ্বারা বদলে নেয় । ধীরে ধীরে সকল খারাপ সংস্কারের বীজ একজন যোগী ধ্বংস করেন । এটির ফলে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যোগী আর যে কোন পরিস্থিতিতে খারাপ কর্ম পুনরাবৃত্তি করে না । তিনি এইভাবে খারাপ সংস্কারের বীজ পুড়িয়ে দেন অথবা খারাপ কর্ম করাতে বাধ্য করে এমন খারাপ সংস্কারের ফাঁদ থেকে মুক্ত হন । তখন তিনি সেনাবাহিনীর একজন লোকের মত পিছু না হটে সোজা মুক্তির দিকে চলে যান । তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন এবং ঈশ্বরের পরম সুখ অর্জন করেন।

সংস্কারের বীজ ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াটির জন্য সম্পূর্ণ আগ্রহ, দৃঢ়তা এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজন।

এই প্রক্রিয়ায় আমাদের কাছে থাকা একমাত্র নিয়ন্ত্রনকারী বোতামটি হলো আমাদের ইচ্ছা-শক্তি ।

বেশিরভাগ লোক এই ইচ্ছাশক্তিকে সঠিক দিকে ব্যবহার করাটা উপেক্ষা করে এবং পরিস্থিতির রজ্জুবদ্ধ নিয়ন্ত্রনের প্রতিক্রিয়ায় মূলত পুতুলের ন্যায় আচরন করে । এভাবে তারা নিজেরাই তাদের অগ্রগতির পথরোধ করে। যোগীগন বিপরীতভাবে কাজ করে ।

এ কারণেই গীতা বলেছেন যে জগতের জন্য যেটি দিন যোগির জন্য সেটি রাত এবং বিপরীতক্রমে জগতের জন্য যেটি রাত যোগির জন্য সেটি দিন ।

যত শক্তিশালীভাবে আপনি আপনার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করবেন, তত দ্রুত আপনি মুক্তিতে পৌঁছবেন।

প্রশ্ন

আপনি বলেন মুক্তি জ্ঞানকে দাবি করে। এর মানে কি, মুক্তি অর্জনের জন্য আমার জগতের সবকিছু জানা দরকার, সম্ভাব্য সবকিছু ?

এমনকি যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আপনি সবকিছু জানতে পারবেন না কারণ আপনি ঈশ্বর নন । জ্ঞান বলতে উপলব্ধিকে বোঝানো হচ্ছে এবং জাগতিক জ্ঞানকে নয় । সুতরাং, আমরা এমন ধারণাগুলির কথা উল্লেখ করছি যেগুলো আমাদেরকে সহজাত জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে এবং কোন কিছুকে ঠাট্টা করে না । ঠাট্টা করাটাও দরকারী এবং সহায়ক, শুধুমাত্র যখন এটি ধারণা উন্নত করতে সাহায্য করে।

যর্জুবেদ ৪০/১৭ এটিকে সুন্দরভাবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেঃ

যিনি স্পষ্টভাবে বিদ্যার ও অবিদ্যার ধারণাকে বোঝেন, কর্মের মাধ্যমে সে অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করেন মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির চূড়ান্ত আনন্দের দিকে (গমন করেন) ।

প্রশ্ন

তাহলে জ্ঞান এবং অজ্ঞতা বলতে আপনি কি বোঝান ?

যোগ দর্শন ২/৫ এই ধারণাটি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । এটি অবিদ্যা বা অজ্ঞতার চারটি ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করেঃ

অস্থায়ীকে স্থায়ী এবং স্থায়ীকে অস্থায়ী বিবেচনা করুন ।

উদাহরণস্বরূপ, এই শরীর এবং সুস্পষ্ট প্রকাশিত জগত সবসময় থাকবে এমনটা মনে করা। এবং আত্মা ও ঈশ্বর যা স্থায়ী, সেটিকে উপেক্ষা করা। আমাদের অধিকাংশই এই অনুসারে কাজ করে, এবং অবিদ্যা মধ্যে পতিত হয় ।

অশুচিতাকে শুচি এবং হিসাবে শুচিত অশুচি রূপে বিবেচনা করা।

উদাহরণস্বরূপ, রক্ত, বর্জ্য, প্রস্রাব প্রভৃতিতে পূর্ণ এই শরীরটিকে বিশুদ্ধ ধরে নেয়া এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও গ্ল্যামারের বা চাকচিক্যের প্রতি কামনা এবং সত্য, নৈতিকতা, ব্রহ্মচার্য, স্ব-নিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা প্রভৃতি মত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অশুচি রূপে উপেক্ষা করা।

দুঃখকে সুখ রূপে এবং সুখকে দুঃখ রূপে বিবেচনা ।

উদাহরণস্বরূপ, সুখ প্রাপ্তির আশায় লালসা, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রম, চূর্ণ, দুঃখ, অনুতাপ, ঈর্ষা, ঘৃণা, অলসতা, অহংকার ইত্যাদি মত নোংরা নীতিবিগর্হিতের মতো আচরণ করা। এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ, সমবেদনা, শান্তি, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, সরলতা, ইত্যাদি (গুনাবলীকে) দুঃখের উৎস হিসাবে ভেবে প্রত্যাখ্যান করা।

চেতনাহীন জড় বস্তুকে সচেতন এবং সচেতন বস্তুকে চেতনাহীন জড় বস্তু রূপে বিবেচনা করা ।

উদাহরণস্বরূপ, এই শরীর এবং মনকে জীবিত রূপে বিবেচনা করাটা অজ্ঞতার একটি লক্ষন । এবং আত্মা ও ঈশ্বর, যারা চেতন সত্ত্বা তাঁদেরকে উপেক্ষা করা ।

অবিদ্যার বিপরীত হলো বিদ্যা বা জ্ঞান।

যখন এই বিদ্যা বা জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, মৃত্যু ও জন্মের একটি চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই আর অবশিষ্ট থাকে না। এই আত্মা তারপর মুক্ত হয় এবং মুক্তি বা শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন

দুঃখ বা কষ্ট বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

আবার যোগ দর্শন ২/৩-৯ এটি ব্যাখ্যা করে, খুব অল্পকথায় দুঃখ এর কারনের মাধ্যমে আসে। এটি বলে যে পাঁচ ধরনের ক্লেশ বা দুঃখ আছে।

অবিদ্যাঃ (অজ্ঞতা)

উপরে বর্ণিত অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই হলো এই সকল দুঃখের জননী এবং অন্যান্য সকল দুঃখের ভিত্তি।

অস্মিতাঃ (অহংবোধ)

এই মন, বুদ্ধি, শরীরকে আমি বলে বিবেচনা করা এবং মিথ্যা গর্ব, শ্রেষ্ঠম্মন্যতা (superiority Complex) বা হীনমন্যতাবোধ থাকা। এইটি অভ্যাস, বিবেক ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে ধ্বংস করা আবশ্যক।

রাগঃ (আসক্তি)

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ ভোগ অনুভূতির প্রবনতা বা সংস্কার এবং এগুলো আরো পাওয়ার জন্য লোভ।

দ্বেষঃ (ঘৃনা)

অতীতে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দুঃখের কারন ছিলো এমন পরিস্থিতি বা বিষয়গুলির বিরুদ্ধে ঘৃণা করা।

অভীনিবেশঃ (মৃত্যুর ভয়)

কখনও মৃত্যুবরণ না করা এবং সবসময় জীবিত থাকার বাসনা। ক্ষুদ্র পিঁপড়া থেকে বুদ্ধিমান পণ্ডিত পর্যন্ত সকল জীবিত সত্তার মৃত্যুভয় আছে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া থেকে নিজেদেরকে প্রতিরোধ করতে সর্বোচ্চ সম্ভব চেষ্টা করা। এটা নিজেই পুনর্জন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যখন কেউ বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র শরীরটাই মরে, কিন্তু আত্মা ঈশ্বরের করুনার অধীনে চিরতরে রক্ষিত হয়, তখন এই ভয় দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন

তাহলে কিভাবে আমরা মুক্তি বা পরিত্রাণ অর্জন করতে পারি ?

আমরা এই বিষয়টির মূলনীতি এবং সারমর্ম নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি । আরেকটু সাধারনভাবে, মুক্তি নিম্নলিখিত মাধ্যমে হয়ে থাকেঃ

'অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর' অনুযায়ী ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং অহংবোধ ত্যাগ করে সত্যকে বুঝা।

খারাপ প্রবণতা যেমন পাপ, অপরাধ, রাগ, হতাশা, অনুতাপ, খারাপ সঙ্গ, খারাপ অভ্যাস, মাতাল, আসক্তি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

যথাযথভাবে সত্যের অনুসন্ধান করা, সমবেদনা, সমগ্র জগতের কল্যাণ, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, ঈশ্বর পূজা, ধ্যানের অনুশীলন এবং সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করা ।

সৎ, আন্তরিক এবং পক্ষপাতহীন হওয়া।

সমাজ এবং বিশ্বের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য থেকে না পালানো।

প্রশ্ন

মুক্ত অবস্থায় আত্মার অবস্থাটা কেমন ? এটা কি সমুদ্রের জলের একটা ফোঁটার মত তার পরিচয় হারায় ?

আত্মা যদি চিরকালের জন্য তার পরিচয় হারাতো, তবে ইতিমধ্যেই তা হারিয়ে ফেলত এবং আমরা একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতাম না কারণ সময়ের কোনো শুরু নেই । তাই অসীম সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যদিও আমরা আমাদের পরিচয় হারাই নি । সুতরাং, ভবিষ্যতে আমাদের এই পরিচয় হারানোর সম্ভাবনাটিও 'শূণ্য' ।

যেটা ঘটে তা হলো আত্মা তার পরিচয় বজায় রাখে, ঠিক যেভাবে একটি লোহার বল উত্তপ্ত আগুন হয়ে যায় । এটার পরিচয় আছে কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আনন্দ মধ্যে নিমগ্ন হয় । এভাবেই এটি তার পরিচয় হারায় ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলি যখন আমরা কোনো উপভোগ্য কাজে নিবিষ্ট হয়ে পড়ি । কিন্তু এর মানে পরিচয় পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলা নয় ।

প্রশ্ন

আত্মার মুক্তি হলে সে কোথায় থাকে ?

আত্মা সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের মধ্যে থাকে। পূর্ন জ্ঞানের অধিকারীর সম্পূর্ণ তত্তাবধানে, এটির চলাফেরা এবং অবস্থানের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

প্রশ্ন

মুক্তির সময় আত্মার কি একটি শরীর থাকে ?

না। মুক্তির সাথে শরীর প্রাসঙ্গিক নয়। মুক্তির দিকে এগিয়ে চলার জন্য শরীর প্রয়োজন এবং মুক্তি পাওয়ার পরে সেটির আর প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন

শরীর ছাড়া আত্মা কিভাবে ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করে ?

আত্মার মৌলিক শক্তি যা তাকে (আত্মাকে) শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহার করতে সক্ষম করে সেটি আত্মার সাথে থাকে। এটি ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি শুনতে, স্পর্শ করতে, দেখতে, স্বাদ, গন্ধ এবং চিন্তা করতে পারে। মুক্তি অর্জনের জন্য সকল সীমাবদ্ধতা যিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন এমন ব্যক্তির জন্য শারীরিক সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন

মুক্তি কি শাশ্বত বা অবিচ্ছিন্ন ?

না মুক্তি শ্বাশত নয়। যদি তাই হত, তবে বর্তমানে আমরা সবাই মুক্তি লাভ করতাম, এবং মুক্তির কামনায় প্রচেষ্টারত কেউ এই জগতে অবশিষ্ট থাকতো না। সৃষ্টির সমগ্র উদ্দেশ্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। এবং যদি আমরা এখন পর্যন্ত মুক্তি লাভ করতে না পারতাম, তবে ভবিষ্যতে মুক্তি অর্জন করা অসম্ভব হতো।

আত্মা জন্মহীন এবং সময়ের কোন শুরু নেই। আমরা অসীম সময়ের জন্য অস্তিত্বমান। অতএব, যদি আমরা অনন্তকালে মুক্তি লাভ করতে না পারি, তাহলে আমরা মুক্তি পাব, এমনটা কখনোই হবে না।

সুতরাং মুক্তি শাশ্বত নয়।

অতএব, মুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, আত্মা দুনিয়াতে ফিরে আসে এবং আবার মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করে।

প্রশ্ন

কত সময় পর্যন্ত আত্মা মুক্তি অবস্থায় থাকে ?

মানুষের জীবনের তুলনায় মুক্তির সময়কাল অনেক বেশি । মুন্ডকোপনিষদ অনুযায়ী, এই সময়কালটি সৃষ্টির ৩৬,০০০ চক্রের সমান সমান। প্রতিটি সৃষ্টি চক্র ৪৩.২ X ২০০ মিলিয়ন বছরের সমান।

সুতরাং যখন শাস্ত্রগুলি বলে যে মুক্তি অনন্ত, তখন তারা আসলে বুঝায় যে মুক্তির এই পূর্ণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, আত্মা মৃত্যু ও জীবনের চক্রের মধ্যে প্রবেশ করবে না।

প্রশ্ন

মুক্তি যে অনন্ত নয় এই বিষয়ে বেদে কি কোন প্রমান আছে ?

ঋগ্বেদ ১/২৪/১-২

প্রশ্নঃ আমরা কাকে বিশুদ্ধতম বিবেচনা করি ? সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে আলোকিত কে ? আমাদেরকে মুক্তি দানের পর কে পুনরায় পৃথিবীতে আমাদেরকে মা ও বাবাকে দেবে ?

উত্তরঃ আত্মজ্ঞানময়, শাশ্বত, সদা মুক্ত একমাত্র ঈশ্বরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ । একমাত্র তিনি আমাদেরকে পরম আনন্দ বা মুক্তি দান করার পর তিনি আমাদের মা ও বাবাকে এই পৃথিবীতে আবার প্রদান করেন ।

শঙ্করাচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮/১৫/১ এবং ৪/১৫/১ এর উপর তাঁর গবেষনামূলক গ্রন্থে বলেছেন যে, আত্মা তাঁর সময়কাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মালোক বা মুক্তিতে থাকে । ৬/২/১৫ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে আত্মাগন কয়েক সম্বৎসর মুক্তি অবস্থায় থাকে । শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৬/১/১৮ এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, "যদি পরিত্রাণের পরে আত্মাগন ফিরে না আসে, তাহলে মন্ত্রের "ইহা" শব্দটি অর্থহীন হয়ে যায়। "

প্রশ্ন

'সীমাহীন মুক্তি' এই বিবেচনায় ভুলটা কি ?

অনেক ভুল ! উপরোক্ত রেফারেন্স অনুযায়ী এটি বেদের বিরুদ্ধে ।

যেহেতু আত্মা জন্মহীন এবং অসীম সময়ের জন্য এর অস্তিত্ব আছে । যেহেতু তখন পর্যন্ত মুক্তি অর্জন করতে পারে নি । এখন যদি 'মুক্তি' ব্যাপারটি শাশ্বত হয় তবে এটি আপনাআপনিই অসম্ভব হয়ে পড়ে । মুক্তি ব্যাপারটি যে শ্বাশত নয়, মুক্তিহীন আমাদের অস্তিত্বই এটা প্রমান করে দেয়।

একটি আত্মার কর্ম সীমিত । সীমিত কর্মের ফলগুলি সীমাহীন হতে পারে না ।

যদি মুক্তির শাশ্বত হয়, তাহলে ক্রমান্বয়ে সকল আত্মা মুক্তি অর্জন করার পর জগত সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু আত্মা জন্মহীন, নতুন আত্মার সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এবং যদি আত্মার সৃষ্টি হয়, তাদের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যদি মুক্তি চক্রাকার না হয়, তাহলে এমনকি মুক্তিও একটি কারাগারে পরিণত হয়, যেখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না।

যদি অনন্ত সময় ধরে চলতে থাকে তবে এই আনন্দের মূল্যও হ্রাস পায় । মনে রাখবেন, আত্মা ঈশ্বর না যে পূর্ণমাত্রায় সুখ অনুভব করতে সক্ষম হয় । আত্মার সুখ ভোগ করার ক্ষমতাও সীমিত। সুতরাং, একমাত্র মুক্তির পুনরাবৃত্তিই আত্মার জন্য সর্বোত্তম ন্যায় বিচার।

প্রশ্ন

যদি মুক্তি থেকে ফেরত আসতেই হয়, তাহলে কেন এটির জন্য এত প্রচেষ্টা ? সর্বোপরি, এটিও অস্থায়ী!

আত্মার ক্ষমতা সীমিত এবং জ্ঞানও সীমিত । সুতরাং, এমন কোনকিছু, যেটা তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করে, এটিকে অস্থায়ী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

পৃথিবীতে আমরা ১ ঘন্টা, এক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বছরের সুখের ব্যবস্থা করার জন্য অনেক প্রচেষ্ট করি । আমরা খুব পরিকল্পনা করি মাত্র ১০০ বছরের জীবনের একটা জীবনের জন্য, যদিও সম্পূর্ণরূপে এটা জানি যে এই ১০০ বছর পর এই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা আজকে খাই এবং আগামীকাল সকালের খাবারের জন্য পরিকল্পনা শুরু করি।

যখন একজন ব্যাক্তি এমন স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে পারে, তবে কেন মুক্তির মত এই বিশাল সময়কালের জন্য চেষ্টা করবে না, যেটা এত বড় সময়কাল যে আমাদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব ?

প্রশ্ন

আমি আপনার যুক্তিতর্কগুলো দেখেছি। কিন্তু আমি মুক্তির একটি ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাস করি। উদাহরণস্বরূপ, মুক্তি অনন্ত নয় এটা আমি এখনো বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি আত্মা এবং ঈশ্বর এক। আমার অন্যান্য মতপার্থক্যও আছে। আমার কি করা উচিৎ ?

এই পার্থক্যগুলির অনেকগুলোই উদ্ভুত হয় ধারনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার সময় পরিভাষাগত কারনে এবং ব্যাখ্যায় রূপক ব্যবহারের কারনে, এই কনসেপ্ট বা ধারনাগুলোকে উপলব্ধি করতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মন নিয়ন্ত্রনের দরকার হয়।

মুক্তি ঠিক কেমন এটা বোঝা যাবে শুধুমাত্র যখন আমরা সে অবস্থায় পৌছব তখনই। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট এবং দ্ব্যার্থহীন যে এই জগত যা আমরা দেখতে পাই, এটাই সবকিছু নয় । এর পরেও কিছু আছে, এবং বর্তমান জন্ম ও মৃত্যুর পরেও আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান । তাই মুক্তির জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত।

অধিকন্তু, উপলব্ধিরও অতীত এই মুক্তি শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আসতে পারে, এবং এটি আমাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফলাফল।

সুতরাং, যদি আপনি ভিন্নভাবে ভাবেনও, সেটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই । মুক্তির ধারণার বিষয়ে আপনি যা মনে করেন বা আমরা যা মনে করি সেটা বিবেচনায় না রেখে বরং এটা ভাবুন এই মুক্তি অবস্থাটি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বর্তমান কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের উভয়ের মতামত এক এবং সেটা হচ্ছে, অজ্ঞতা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।

সুতরাং, গন্তব্যস্থলটি কেমন হবে এই ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের কল্পনার ভিন্নতাকে দূরে রাখলেও, সামনের পথ আমাদের জন্য একই ।

প্রশ্ন

মুক্তি কি এক জন্মে ঘটে না কি একাধিক জন্মে ঘটে ?

মুক্তি পেতে অনেকগুলি জন্মের প্রয়োজন হয় কারণ প্রত্যেকটি সংস্কার নির্মূল হতে তার যথোপযুক্ত সময় ও প্রচেষ্টা দরকার হয় । যাহোক, দয়া করে মনে রাখবেন যে, আমরা জানিনা এ জন্য ইতিমধ্যেই কতবার আমরা জন্ম নিয়েছি । অতএব প্রত্যেকের উচিত বর্তমান জন্মের মধ্যেই মুক্তি অর্জনের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করা । সর্বোপরি, প্রচেষ্টার তীব্রতা নিজেই এই বিষয়টাকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন

যদি অনেকগুলো জন্ম থাকে, কেন আমরা সেগুলো মনে করতে পারি না ?

আত্মার জ্ঞান সীমিত এবং সেইজন্য মস্তিষ্কের মধ্যে যা সংরক্ষণ আছে তার বাইরে সে কিছু স্মরণ করতে পারে না । পূর্বের জন্ম বাদ দিন; আমরা গর্ভে কেমন ছিলাম সেটাই মনে করতে পারি না । আমরা আমাদের শৈশব মনে রাখি না, ভুলে যাই । আমরা গত কয়েক বছরের আমাদের স্বপ্ন বা আমাদের কর্ম মনে রাখতে পারি না । যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি আপনার জন্মের বারো বছর পরের ৪ মাস, ৩ দিন, ৩ ঘণ্টা এবং ৫ মিনিটে আপনি কি করেছিলে বা ভেবেছিলেন ? আপনি স্রেফ উত্তর দিতে পারেবেন না । বাস্তবে, আপনি

আপনার কয়েক ঘণ্টার আগের চিন্তাভাবনার হিসাবও ঠিকমত করতে পারবেন না। এর মানে কি আপনি তখন অস্তিত্বমান ছিলেন না ?

আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে আমরা অতীত জীবনকে স্মরণ করি না এবং তাই নতুন ভাবে কাজ করতে পারি। আমরা আমাদের এই জীবনের কাজ, চিন্তা এবং দুঃখদায়ক ঘটনাগুলো দ্বারা হতাশায় ভুগি এবং সেগুলোকে ভুলে যেতে চাই। কল্পনা করুন আমরা যদি অতীত জীবনেরও সমস্ত দুঃখ স্মৃতি মনে করতাম। আমরা কেবল সেগুলো স্মরণ করেই মারা যেতাম!

অতএব, অতীত জীবন সম্পর্কে জানাটা ঈশ্বরের বিভাগ। আমাদের বিভাগ হলো আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করে মহান কাজের মাধ্যমে অজ্ঞতাকে দূর করা।

প্রশ্ন

আমরা যেহেতু অতীত কর্মের কথা মনে রাখিনা, তবে কেন ঈশ্বর সেই অতীত কর্মের জন্য আমাদের শাস্তি দেন ?

আপনার যদি জ্বর হয়, তাহলে আপনি চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যান। আপনি জ্বরের কারণ জানেন না বা কিভাবে আক্রান্ত হলেন তা জানেন না। কিন্তু আপনি খুব ভালভাবে স্বীকার করেন যে, কিছু ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে যেটা এই জ্বর সৃষ্টির কারন।

অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের কর্মের বিধান বোঝার জন্য অতীতের কাজের স্মৃতিগুলির প্রয়োজন হয় না। আমরা বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান, স্বাস্থ্য, প্রজাতি ইত্যাদি দেখি। এবং আমরা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারি যে, সকল কিছুই এমন একটা পরিকল্পিত উপায়ে এই ধরনের বিশদ জটিল পদ্ধতিতে ঘটছে যে, 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সকল বড় বড় দাবি সত্ত্বেও আমরা এমনকি ভুমিতে ১% দাগও কাটতে পারিনি।

এই বিশ্বের বৈচিত্র এবং পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, মহান পরিকল্পনাকারী আমাদেরকে পূর্বের কর্মের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি প্রদান করেন।

আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি যারা অর্ন্তদর্শন করে তারা ভালো কাজের সরাসরি উপকারীতা এবং নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে খারাপ কাজের ক্ষতির সাক্ষ্য হন। তাহলে কেন এই (ভালো মন্দের) ব্যাপারটি এই জীবনের পরেও ঘটবে না?

অতএব, আমরা যদিও অতীত জীবনকে স্মরণ করি না, তবে জগত নিজেই সাক্ষী, ঈশ্বর ক্রমাগত আমাদের কর্ম অনুসারে আমাদেরকে পরিস্থিতি প্রদান করেন, এমনকি এটা এই

জন্ম শেষ হওয়ার পর এবং নতুন জন্মের সময়ও।

প্রশ্ন

যেহেতু অনেক জনম আছে এবং ঈশ্বর আমাকে জীবনের পর জীবন দান করছেন, তাহলে আমি মুক্তি পেতে কেন তাড়াহুড়া করব ? আমি আমার বর্তমানকে ভালো উপভোগ করছি তাই আমি যে পথে আছি সেখানেই থাকতে দাও।

এই যুক্তিটি বি-স্কুলের নতুন বুদ্ধিমান এমবিএ ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্র থেকে এসেছে ! কিন্তু ঈশ্বর অধিকতর বুদ্ধিমান।

এই বিশ্বের মধ্যে, হয় আপনি এগিয়ে যাবেন অথবা আপনি পিছিয়ে যাবেন। অগ্রগতি ছাড়া স্থিতিশীল থাকা এটাও পিছিয়ে যাওয়া। জগতের দিকে দেখুন; আপনি একটি ছোট শিশুর সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসেন। এটা খুবই সুন্দর ও ফুটফুটে। কিন্তু আমরা কেবল কয়েক মাসের জন্য এর আকর্ষনীয়তা উপভোগ করি। ভাবুন, যদি কয়েক বছর পরেও, শিশুটি একটি ফুটফুটে ছোট শিশু থেকে যায়, তাহলে কি হবে ? আমরা সকলে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করব এবং এটিকে একটি বিরল গুরুতর রোগ হিসেবে বিবেচনা করব। আমরা সবাই প্রার্থনা করি যে সন্তানরা যেন বেশ স্বাস্থ্যকরভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং ঈশ্বরও এটা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে দাবি করেন।

এমনকি ব্যবসা বিষয়ক ক্ষেত্রেও, যদি কোনও কোম্পানি বছরের পর বছর একই কর্মক্ষমতা দেখায় কোনো প্রবৃদ্ধি না দেখায়, তবে তার মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নমুখী হয়।

একইভাবে, আমরা যদি অগ্রগতির জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা না করি, আমরা আসলে আমাদের মূল্যকে হ্রাস করছি। এবং তাই, পরবর্তী জীবন বর্তমান জীবনের তুলনায় খারাপ হবে। এমনকি আমাদের মনুষ্যতাকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই কিছু সক্রিয় প্রচেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন

পশুরা কি মুক্তি পেতে পারে না ?

হ্যাঁ, তারাও মুক্তি পেতে পারে কারণ সকল জীবিতের আত্মা অভিন্ন। কিন্তু মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণের পরই তারা মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে পারে।

মনে রাখবেন, মানব প্রজাতিই একমাত্র প্রজাতি যা পরিত্রাণ অর্জনের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। বাকী প্রজাতিগুলো চিকিৎসা কেন্দ্রের মতো, যেখানে তারা আগে

থেকে করা কর্মের ফলগুলি ভোগ করতে পারে, যাতে তাদের গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কারগুলো ধুয়ে মুছে যায়।

এভাবে, নির্দিষ্ট ধরনের আসক্তি বা অভ্যাস দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষেরা যথোপযুক্ত পশু প্রজাতিতে জন্ম নেয় যাতে তারা ঐসকল সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পায় । একবার এই সীমার প্রান্ত অতিক্রম করে নিষ্কৃতি পেলে, তারা মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে এবং তারপর মুক্তি পেতে প্রচেষ্টা করে।

অতএব, সকল মানুষ্যের উচিত পরবর্তী জন্মে পুনরায় মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ নিশ্চিত করতে সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা এবং মুক্তির পথে তাদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা । মনুষ্য জন্মের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই, এবং আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করা উচিত।

প্রশ্ন

কিন্তু অজ্ঞতাও একধরনের সুখ। একজন ধনী ব্যক্তি বিলাসী বিছানায় ঘুমায় কিন্তু খুশি না। এবং একজন শ্রমিক শক্ত পাথরের উপর ঘুমায় কিন্তু শান্তিময় ঘুমের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। জঙ্গলের প্রাণীরা এত সুখীভাবে বসবাস করে। এবং মানুষ উদ্বেগে থাকে। তাই জ্ঞানের পরিবর্তে, অজ্ঞতাই আনন্দের হয়।

এইটি বালকসুলভ যুক্তি। অবিলম্বে একজন মজুরকে ধনবান হওয়া বেছে নিতে দিন এবং একজন ধনবানকে শ্রমিক হওয়া বেছে নিতে দিন। ধনী কখনও সম্মত হবে না এবং শ্রমিক অবিলম্বে এই সুযোগটি গ্রহন করবে । উভয়ই যদি সমান সুখী হতো, কেউই তার বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করতে আগ্রহী হতো না।

কোন বুদ্ধিমান মানুষ প্রাণী হতে চায় না কারণ মানুষ সুখের উচ্চতর মাত্রা উপলব্ধি করতে পারে যা প্রাণীরা পারে না।

ধনী ব্যাক্তির সম্পদ নয় বরং তার ক্রুটিপূর্ণ চিন্তাই তার দুঃখের কারণ । এই ক্রুটিপূর্ণ উপায়টি হলো তার নিজের কর্ম।

অজ্ঞতা সুখ অর্জনকে সীমিত করে । কম জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়াটা আত্মার জন্য স্বাভাবিক প্রবণতা। উচ্চতর জ্ঞানের কারণে আপনি ১বছর-বয়সী বাচ্চাদের গেমস উপভোগ করেন না । যারা অজ্ঞতাকে তুলনা করে, এই দাবী করে "অজ্ঞতাই হল সুখ" এই দাবি নিজেই ক্রুটিপূর্ণ জ্ঞান বা অবিদ্যা।

কিন্তু যদি আপনি বিদ্যা অনুসন্ধান করেন, আপনি উচ্চ হতে উচ্চতর আনন্দ পাবেন। অন্য কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন

স্বর্গ / নরক কি ?

স্ব মানে সুখ। সুখ অর্জন করাই স্বর্গ। দুঃখ অর্জন করাই নরক।

এগুলো কোনও কাল্পনিক স্থান বা অবস্থানকে বোঝায় না। এটা বোঝায় আমরা আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের জন্য কি পরিস্থিতি তৈরি করেছি।

এবং যখন আমরা প্রতিটি মুহুর্তে স্বর্গ খোঁজের অভ্যাস করব, অজ্ঞতার সকল শিকড় ধ্বংস হয়, এবং আমরা পরম সুখ বা ঈশ্বর প্রাপ্ত হই।

মৃত্যুর পরে আমরা স্বর্গ বা নরকের মত কোনও বিশেষ স্থানে থাকব এমন বিভ্রম দূর করা উচিত। আমাদের এই ধরনের বিশ্বাস করা বন্ধ করতে হবে, যারা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষন করে তারা নরকে যাবে এবং অন্যেরা চিরদিনের জন্য স্বর্গে যাবে। আমাদের সকল ধর্মের এবং সকল মানুষের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত যতক্ষন পর্যন্ত তারা অপরাধী না হয় বা উপদ্রব সৃষ্টিকারী না হয়। স্বর্গ লাভ করার জন্য, সকল আত্মার প্রতি সহমর্মিতা থাকা দরকার এবং তারপর মুক্তি বা মোক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

প্রশ্ন

ঠিক আছে। আমি পরিত্রাণ অর্জনের জন্য অজ্ঞতা দূরকরন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। দূরবর্তী স্থানে গিয়ে ধ্যান করা এবং পরিত্রাণ লাভ করার এটাই কি কারন ?

কিছু নির্দিষ্ট মন্ত্র মুখস্থ করাটা বা বুদ্ধিগতভাবে নির্দিষ্ট ধারণাগুলি বুঝা বৈদিক জ্ঞান নয়। এটি হলো সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাহা চিন্তা, শব্দ এবং কর্মের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। জ্ঞান, কর্ম এবং গভীর চিন্তায় প্রদর্শিত হয়।

এটা সাইকেল শেখার মতো। কেবল সাইকেল উপর লেখা একটি বই পড়া এবং তার নকশা সাইকেল চালানো শিখতে সাহায্য করবে না। আপনাকে অনুশীলন করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

একইভাবে, পরিত্রাণের অর্জনের জন্য আপনাকে এই জগতের মধ্যে থাকতে হবে, এখানে পদ্মের মত বসবাস করুন, চারপাশের কাদা থেকে পৃথক থাকুন এবং প্রণালীটাকে পরিষ্কার করার জন্য প্রচেষ্টা করুন। যখন আপনার দায়িত্ব ও কর্ম, এই জগতে আপনার সম্পৃক্ততাকে

দাবি করে, তখন ধ্যানের জন্য দূরে চলে যাওয়া মুক্তির দিকে চালিত তো করবেই না বরং নির্বুদ্ধিতার দিকে চালিত করবে যেটা মুক্তির বিপরীত।

নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদে উপযোগী হতে পারে, কিন্তু মুক্তি অন্য আত্মাকে সহযোগীতা ছাড়া আসতে পারে না। কেবলমাত্র সহযোগিতার ব্যাপারে বেদে অগনিত সুক্ত রয়েছে।

যারা বেদের সবচেয়ে আবশ্যিক বিষয় ছাড়াই মুক্তি অন্বেষন করার চেষ্টা করে, তারা স্রেফ হতাশায় পতিত হয়।

প্রশ্ন

তাহলে ঐ সকল সন্যাসী ও মুনি যারা জঙ্গলে ধ্যান করতেন তাদের কি হবে? তাঁরা কি পলায়নপর ছিলেন ?

আপনি যদি আজকের জঙ্গলের সন্যাসীদের সম্পর্কে বলেন, এক্ষেত্রে যদি তারা জঙ্গলে সাময়িকভাবে নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যায় অথবা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তারা যদি সমাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের জঙ্গলে যাওয়াটা ঠিক আছে।

কিন্তু যদি তারা সক্ষম কিন্তু তারপরো স্থায়ীভাবে নির্জনে জীবন কাটাতে চায়, তাহলে তারা পলায়নপর এবং নির্বোধ। আসক্তি থেকে মুক্তির নাম বৈরাগ্য হওয়া উচিত এবং কর্ম থেকে মুক্তির নাম নয়।

এই ধরনের কৃত্রিম নির্জনবাস ঈশ্বরের প্রতি অপমান। যদি ঈশ্বর ভাবতেন যে জনবিচ্ছিন্নতা আপনার পক্ষে ভাল, তবে তিনি আপনাকে কোন নির্জন গ্রহে জন্ম দিতেন, মানুষে পূর্ণ সমাজের মধ্যে জন্ম দিতেন না এবং সমস্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুলোর মুখোমুখি করাতেন না। এছাড়াও, আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেন সেটা জগতের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমেই করেন। যদি আপনি পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ করে দেন, তবে আপনি আরও জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ হারাবেন।

যদি আপনি একটি আদর্শবাদী সমাজে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে প্রত্যেকে তার কর্তব্য তুলনামুলক ভালোভাবে পালন করে, তাহলে হয়তো আপনার ভিড় থেকে দূরে গিয়ে জগতকে অনুসন্ধান করার জন্য স্বাধীনতা থাকতো।

কিন্তু আজকের দিনে, যখন সমাজে এত দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, দারিদ্র্য, দুঃখ ও অনৈতিকতা হয়, তখন কেবল একমাত্র মানসিক বিকারগ্রস্থ বা বীর্যহীন কাপুরুষই কেবল

এই সমস্যাগুলো থেকে পালাতে চায়, ঈশ্বর চান আমরা যেন সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই, কর্ম করি এবং এভাবে বৈরাগ্য অর্জন করি ও অজ্ঞতা দূর করি।

এটি একটি দুঃখের বিষয় যে আধ্যাত্মিকতার নামে, আমাদের কর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের একটি বড় কর্মশক্তি জাতি ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব থেকে দূরে পলায়ন করে। এই প্রক্রিয়ায়, তারা শুধুমাত্র নিজের অগ্রগতিকে বিলম্বিত করে নির্বোধিতার দিকে এগোয় না, আরো বরং সমাজ ও জাতির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। জাতি বিরোধী সবচেয়ে বেদনাদায়ক মুখ এটি যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়।

যদি আমরা ইতিহাসের দিকে দেখি, এইসব মিথ্যা বাবা, গুরু, সাধুরা যারা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে অশান্ত বছরগুলির মধ্যে জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় মনের প্রশান্তি খোঁজায় ব্যাস্ত ছিলেন বা অধ্যাত্মবাদের নামে মামুলী যাদু করেছেন সেগুলো ছিলো আধ্যাত্মিকতার ভুল উদাহরণ। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এধরনের মিথ্যা আদর্শের ব্যাক্তিগন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছি। এ কারণেই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও, আমরা এখনও বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বলতম এবং সবচেয়ে নির্লজ্জ অসহায় সমাজগুলোর একটি যারা ১,০০০ বছর ধরে একের পর এক চড় খেয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন

ঠিক আছে। তাহলে কারা আমাদের অনুসরনীয় ব্যাক্তিত্ব হওয়া উচিত ?

আমাদের আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত অনুসরনীয় ব্যাক্তিত্ব হবে তারাই, যারা জাতি এবং সমাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতে জাগ্রত হয়ে ওঠেছিলো এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের ব্যাক্তি জীবনকে ধ্বংস করেছিলো। তারা ছিলেন সত্যিকারের মুক্তি সন্ধানী এবং শক্তিশালী কর্মের মাধ্যমে আমাদের জন্য বিদ্যা ও বৈরাগ্যের ধারণাগুলির উদাহরণকে তুলে ধরেছেন। তারা আমাদের জন্য সত্যিকারের সাধু ব্যাক্তি। আমি রানা প্রতাপ, শিবাজী, বিসমিল, আশফাকউল্লাহ, নেতাজী, আজাদ এবং স্বামী দয়ানন্দের মতো অসংখ্য কিংবদন্তীর কথা বলছি।

স্বামী দয়ানন্দ প্রতিদিন কয়েক মাইল হাঁটতেন, আসন করে বসতেন এবং ব্যায়াম করতেন, মুদ্গরের অনুশীলন করেতেন এবং সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেন। মুক্তির ধারণাটি কেবল শক্তিশালী ও পরিশ্রমীদের জন্য।

প্রশ্ন

কিন্তু মুক্তি অনেক বয়স হলে পরে ঘটবে, এবং আমাদেরকে তখন পর্যন্ত এত কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমার এত ধৈর্য্য নেই। আমি কি করব ?

মুক্তির সুখ অনেক দুঃখ ও যন্ত্রণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে না । না, একদম না ! আমি আপনাকে এমন কাল্পনিক স্বর্গ চিন্তার লোভ দেখাতে চাচ্ছি না যেটা আপনার নিকটে আসে জীবনভর সকল কষ্টকর কর্মের পরে, যখন আপনি মৃত্যুবরন করেন।

বরং এখানে কৌশল আছে, যেটা আপনাকে সুখের, স্বাধীনতার জগতে বিশেষভাবে প্রবেশের সুযোগ দেবে যা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সুখের চেয়ে অনেক বেশি । আমি সত্যিকারের শর্তহীন সুখের কথা বলছি যেটা আপনি মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এই সুখের জগতে পূর্ণভাবে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতিমুহুর্তে দ্রুত বৃদ্ধি পায় । তাই আপনার স্বর্গ এই মুহুর্ত থেকে আপনার সাথেই থাকছে এবং ততক্ষনই আপনার সাথে থাকছে যতক্ষন আপনি একে চালিয়ে যাবেন।

আমি পূর্ণ সুখের কথা বলছি, তাকে খুশি, মজা, মাস্তি, ধামাল বা যে নামেই আপনি ডাকুন না কেন, এখন থেকে মুক্তি অর্জন পর্যন্ত পুরো পথেই (আপনার সুখ বৃদ্ধি পাবে) !

এই প্রক্রিয়া শুরু করাটাই দারুন আনন্দময় হতে যাচ্ছে, প্রক্রিয়াটি চলাকালীন আরো আনন্দ হবে, প্রক্রিয়াটি শেষ হলে পরম আনন্দ হবে ! এই জগতের অন্য কোন কার্যকলাপ বা বস্তু আপনাকে এ ধরনের আনন্দ দিতে পারবে না ! যর্জুবেদ ৩১/১৮ মন্ত্রে বেদ এটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে “এক কথায় পূর্ণ আনন্দ পেতে এইটি ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই"

প্রশ্ন

কিন্তু আমি শুনেছি যে আমরা আমাদের কর্মের ফলাফল পাই শুধুমাত্র অনেক যাতনার পরে । এটা কি সত্য নয় ?

সাধারণভাবে প্রচলিত, আধ্যাত্মিকতা বা ধার্মিকতা সম্পর্কে অনেকগুলি ভুল ধারণার একটি হল যে, অনেক নির্যাতন এবং ব্যর্থতার পরেই আপনি ফলাফলগুলি পাবেন । এবং কোন ব্যাক্তি এই ফল লাভ করেছে এটা দেখতে কেউই জীবিত থাকবে না !

এই ধারনাটা সত্য থেকে অনেক দূরে (অর্থাৎ সত্য নয়)।

আসলে, এটি যেকোন আধ্যাত্মিক মতাদর্শ বা ব্যক্তির একটি পরীক্ষা । যদি এটি (কোন আধ্যাত্মিক মতাদর্শ বা ব্যক্তি) যন্ত্রনা ও দুশ্চিন্তা মোকাবেলা করার ব্যাপারে গর্ব করে তবে এটি ত্রুটিপূর্ণ। এটিকে স্রেফ প্রত্যাখ্যান করুন এবং যতটা দূর সম্ভব আপনি এই বিষ্ঠা থেকে দূরে থাকুন !

ঈশ্বর এর ন্যায়বিচার তাৎক্ষণিক এবং চলমান। কোন বিলম্ব নেই। যখন আপনি সঠিক কাজ করেন, আপনি অবিলম্বে সুখরূপে ফলাফল পাবেন । আপনি কেবল এই সুখ বা আনন্দকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরিত্রাণ বা মুক্তির ধাপে পৌছান।

যর্জুবেদ ১৯/৩০ এটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেঃ "যখন আপনি (কোনকিছুর জন্য) স্থির সংকল্প করেন, আপনি শীঘ্রই তা প্রাপ্ত হন । যখন আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে আপনার যোগ্যতা বজায় রাখেন, আপনি সুখ, কৃতিত্ব, সন্তুষ্টি, ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল পান । যখন আপনি ইতিবাচক ফলাফল পাবেন, আপনার বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং আপনি আপনার কর্মকে আরও অধিকতর বৃদ্ধি করান। যখন বিশ্বাস অদম্য হয়, আপনি তখন পরম সত্য বা সুখ অর্জন করেন।"

প্রশ্ন

তাহলে কেন আমরা মুক্তির অনুসরনকারী মানুষ বা সাধুদের বা মুক্তিযোদ্ধাদের বা মহান মানুষদেরকে এত কষ্ট ভোগ করতে দেখি?

আসলে যেটা ঘটে তা হলো যখন কেউ মুক্তির কৌশল অনুশীলন শুরু করে, তিনি বা জগতের বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেন । এইভাবে, তিনি ঐ সকল ক্ষুদ্র বিষয়গুলির দ্বারা বিচলিত হন না যে বিষয়গুলো অন্য লোকেদের স্নায়বিক বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তার নিজের মধ্যে থাকা সুখের জলাধারে প্রবেশ করতে শুরু করেন এবং এইভাবে এই জগতে কোনকিছু পাওয়ার আর বাকী থাকে না।

যেহেতু তিনি অনেক জোরালো এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন, তিনি এখন মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আরো উচ্চাভিলাষী চ্যালেঞ্জগুলি নিতে পারেন । এইটি বাদবাকি জগতের কাছে আশ্চর্যজনক লাগে। যেহেতু সে নিজের পথ নিজে সংজ্ঞায়িত করছে, এটি জগতের সাধারন প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মানুষ ও চারপাশের পরিস্থিতি তার জন্য সমস্যা ও বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র তার জন্য একটি ফিডার হিসাবে কাজ করে ঠিক যেভাবে আগুন দাহ্য বস্তু পেলে বহুগুন বর্ধিত হয়।

অবশেষে, তার এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আসে এবং (পরজন্মে) অন্য কোথাও মুক্তির পথে যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার সময় আসে । মানুষ বোকার মত মনে করে যে তাকে তার জীবনে কষ্ট ও আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই জানে যে সে তার সাফল্যের সমস্ত পথ হাসতে হাসতে পাড়ি দেয় এবং তাঁর অতীত কর্মের ফলে সৃষ্ট এইসব পরিস্থিতি দ্বারা সে কোন ভাবেই বিচলিত হয় না এবং এগুলোকে সে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

এইভাবে, যোগী প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভালোভাবে উতরে যান সেই দয়ালু ঈশ্বর তাকে পুরষ্কৃত করেছেন, তিনি পুরো পথে মজা করেন এবং তাঁর যাত্রাকে সম্মুখে চালিয়ে যান এবং উদাহরণ স্থাপন করেন।

মুক্তি-প্রার্থীরা সবসময় বাকিদের চেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে এটা সত্য নয়। বরং এটাই ঠিক যে তারা বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম, যা আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে। তারা আসলে, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের চেয়ে হাজারগুন বেশি উপভোগ করে। এই আনন্দ তাদেরকে চালিত রাখে।

একটি মশার কামড়ে একটি ছোট শিশু 'ওঁয়া ওঁয়া' করে কান্নাকাটি করে। কিন্তু শক্তিশালী শরীরের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের মধ্যে অনেকেই মার্শাল আর্ট অনুশীলনের সময় ঘুষি ও লাথির মুখোমুখি হওয়া উপভোগ করে।

মুক্তির অভ্যাস আপনাকে সাধারন বিষয়ে কাঁদুনে শিশু থেকে বিশ্বের মল্লক্ষেত্রে স্বর্ণজয়ী শক্তিশালী কুস্তিগীরে রূপান্তরিত করে!

প্রশ্ন

উত্তেজনাপূর্ণ লাগছে! চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?

বেদনাদায়ক কিছু করতে হবে না! আপনি যদি এই সংকল্পটি গ্রহণ করেন তাহলে আপনি ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াটি শুরু করেছেন। বাকীটা সহজ।

বেসিক মূলনীতিটি সহজতরঃ "সত্য গ্রহণ করুন এবং সক্রিয়ভাবে মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করুন।"

যেহেতু মিথ্যা দুঃখের কারণ এবং সত্য হলো সুখের কারণ। পাপপূর্ণ কার্যকলাপ দুঃখের কারণ এবং ধর্মাচারী কার্যকলাপ সুখের কারণ।

প্রশ্ন

সত্য কোনটি এবং কোনটি মিথ্যা তা আমি কিভাবে নির্ধারণ করব?

কিছু সহজ লক্ষন (pointers) আছেঃ

এটি স্ব-বিরোধী হবে নাঃ

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে ঈশ্বর পরীক্ষা করেন এবং একই সাথে এটাও বলে, ঈশ্বর সবকিছু জানেন তবে এটি হবে পারষ্পরিক বৈপরীত্য।

কারণ ও এর প্রভাব (cause effect) সম্পর্কিত যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেঃ

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে, একজন নারী একজন পুরুষের পাঁজর থেকে জন্মলাভ করে, তাহলে তা অযৌক্তিক।

এটি সাধারণীকরণের (generalization) নীতি অনুসরণ করবেঃ

যদি কোনকিছু আমাকে আঘাত করে, তবে এটি অন্যদেরকেও আঘাত করবে। অতএব, আমার এমন কিছু করা উচিত নয়।

এটি আদর্শ ব্যাক্তিত্ব এবং মহান মানুষ দ্বারা স্থাপিত উদাহরণ অনুযায়ী হতে হবেঃ

যদিও, আদর্শ ব্যাক্তিত্ব হিসেবে কোনো ব্যাক্তি মূল্যায়নের যোগ্য কিনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রত্যেকের উচিত তাকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে যাচাই না করে, বরং সত্যের অন্যান্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে ব্যক্তির কাজগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা।

এটা অভ্যন্তরীণ বিবেক বা আভ্যন্তরীণ কন্ঠস্বর অনুসারে হবেঃ

যদি কেউ কোনকিছু করতে লজ্জা বা দোষ অনুভব করে তবে সেটি করা উচিত নয়।

এটি প্রমাণ, যুক্তি, তুলনা, ইত্যাদির গুণাবলি উপর পরীক্ষিত হবেঃ

একইভাবে, অন্যান্য মানদণ্ডও অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু চাবিকাঠি হচ্ছে, চাপ, জনপ্রিয়তা, অভ্যাস ইত্যাদি থেকে কোন কিছুকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার কোনও যথাযথ কারণ ছাড়াই কাউকে সন্দেহ করাও কারো উচিত নয়।

যদি কেউ তার ভালো উদ্দেশ্যগুলোর জন্য অকপট বা আন্তরিক হয়, তাহলে তার মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করার ক্ষমতাটির উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে।

প্রশ্ন

ঠিক আছে, সত্য কিভাবে সনাক্ত করা যায় এবং এর অনুসরন করা যায় সে সম্পর্কে আমি একটি ধারণা পেয়েছি। এরপর বলুন ?

চিন্তা শব্দ, এবং কর্মের মধ্যে এখন স্রেফ সত্য অনুসরণ করুন। উচ্চতর জ্ঞান, অনুশীলন এবং গভীর চিন্তার মাধ্যমে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছান।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি এটি বুঝতে পারেন যে-

এই বিশ্ব একটি এলোপাতাড়ি ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা (সম্ভাব্যতার মাপকাঠিতে) প্রতি জিলিয়নে একেরও কম।

আপনি ভালভাবে জানেন যে আপনি এটি নিয়ন্ত্রণ করছেন না,

আপনি বুঝতে পারেন যে যদি মহৎ শক্তি আমাদের পরিচালনা করে, তবে তিনি শুরু থেকেই নির্দেশিকা প্রদান করবেন,

আপনি জানেন যে বেদ বিচ্যুতি বিহীন, এটি যেভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তার কারনেই এটি বিচ্যুতি বিহীন এবং প্রাচীনতম গ্রন্থ,

আপনি জানেন যে আপনার নিজের বুদ্ধিমত্তা আপনার অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট নয় তাই আপনার বেদ যা শিক্ষা দিয়েছে তার অন্বেষণ করা উচিত এবং শিখতে চেষ্টা করা উচিত।

আপনি আরো জানেন যে, ভৌগোলিক কারণে বেদ থেকে দূরে থাকা মানুষগুলোকেও ঈশ্বর সমানভাবে আশ্বীর্বাদ করবেন । অতএব, বেদ বুঝবার উপায় নিছক দক্ষতা অর্জন হতে পারে না । এটা হতে হবে অধিকতর অনুশীলন ভিত্তিক, বরং দক্ষ হয়ে উঠা বা পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন, তাদের নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে ঐ অনুশীলনকে বর্ধিত করতে সহায়তা করে। তাহলে এখন আপনি দ্রুত অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা পেয়েছেন।

প্রশ্ন

কিন্তু আমি কোনটি অনুসরণ করব, বেদ নাকি আমার ভেতরের কন্ঠস্বর ?

এক দিকে, সত্যের অনুশীলন করার জন্য আপনার অন্তরের কন্ঠস্বর অনুসরণ করা উচিত। অন্য দিকে, বেদের ধারণার আত্মভুত করার জন্য আপনার কাজ করা উচিত, ভিতরের কন্ঠস্বরের সাথে সমন্বয় সাধন করে এবং ভিতরের কন্ঠস্বরকে আরো শক্তিশালী করে তুলে এ কাজ (বেদের ধারনা আত্মভুত) করা উচিত এবং এভাবেই অনুশীলনের মাধ্যমে অগ্রগতি হয়। এবং যখন এই উভয়টি মিলিত হবে, আপনার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

যদি আপনি বেদে প্রবেশ করতে না পারেন বা আপনার বর্তমান দায়িত্ব যদি আপনাকে (বেদজ্ঞানের) সম্পূর্ণ গভীরতা অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে, চিন্তা করবেন না, কেবল ভিতরের কন্ঠস্বর অনুসরণ করুন এবং এগিয়ে যান । ঈশ্বর আপনার জন্য সেরা সুযোগ খুঁজে বের করে দেবন ।কিন্তু যদি আপনার বর্তমান দায়িত্বগুলোর মধ্যেও বেদকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে, তাহলে অবিশ্বাসী না হয়ে, অলস বা অকারণে সমালোচনাকারী না হয়ে, স্রেফ এগিয়ে যান এবং সুযোগটি নিন।

সুযোগকে কাজে লাগানোর এই অভ্যাস আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাবে। একবার আমরা এই মৌলিক ভিত্তির উপর সম্মত হলে, বাকি কাঠামো অত্যন্ত স্ব-উপলব্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন

এই মুহূর্ত হতে মোক্ষ বা মুক্তি বা পরম সুখ অর্জনের জন্য এই উপায় কী ?

এতে চারটি উপাদান রয়েছেঃ

* বিবেক বা ধারণাকে বোঝা। এটাকে বুদ্ধিমত্তা বলা যাক।

* বৈরাগ্য বা বিচ্ছিন্নতা

* ষটক সম্পত্তি বা ৬ গুন সূত্র

* মুমুকশুত্ব বা মুক্তি জন্য বাসনা

উল্লেখ্য যে, এইটি হলো পয়েন্টগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করার আরেকটি উপায় এগুলো উপাসনা অংশে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আমরা ঈশ্বরের উপাসনার ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আরও ভালভাবে বুঝার জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য এটা অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন

বিবেক বা বুদ্ধিমত্তা কি ?

মিথ্যা থেকে সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা হলো বিবেক। যদি আপনি বিদ্যার উপর হওয়া আলোচনাটিকে স্মরণ করেন, তাহলে বিদ্যা অর্জনে সক্ষম আপনি এটি বুঝতে পারবেন।

বিবেকের সঙ্গে, প্রত্যেকের উচিত গভীর চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে (নিজ আত্মাকে) বুঝা এবং বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা। এগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য ঋষিরা পঞ্চ কোষের (তিনটি অবস্থা এবং পাঁচটি শরীরের) ন্যায় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদান করেছেন। কিন্তু এগুলো জটিল হলেও চিন্তা করবেন না। তারা অনুশীলন মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধ হতে পারে কিন্তু পড়াশুনার মাধ্যমে উপলব্ধ হবে না।

প্রশ্ন

কিন্তু এখনও, আমি সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাই পঞ্চ কোষ কি ?

এগুলো আত্মার পাঁচটি স্তর যাহা আমাদের থেকে ভিন্ন (আমি)।

অন্নময় কোষ হলো ত্বক, মাংস এবং হাড়ের তৈরী বাহ্যিক অঙ্গ।

প্রাণময় কোষ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেটা প্রয়োজনীয় বাতাসের পরিবহন নিশ্চিত করে। এতে দশ ধরনের প্রাণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

মনোময় কোষ হলো মন, অহংবোধ এবং বাক, চলন, লোভ, রেচন ও প্রজনন ইত্যাদি কাজের সহজাত ক্ষমতা।

বিজ্ঞানময় কোষ হলো বুদ্ধি, চিত্ত, শ্রবণশক্তি, স্পর্শ, গন্ধ, দর্শন এবং স্বাদ ইত্যাদি অনুভুতির সহজাত ক্ষমতা।

আনন্দময় কোষ হলো আনন্দ ও স্নেহের অনুভূতি। কম বেশি আনন্দের অনুভুতি।

এই পাঁচটি স্তর থেকে আত্মা কিভাবে আলাদা এবং কিভাবে ঈশ্বর এই স্তরগুলোর সঙ্গে আত্মাকে একীভুত করেছেন যাতে এটি সন্ধিহীন এবং কার্যকরভাবে তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বহন করতে পারে, প্রত্যেকের তা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেকের বুঝা উচিত আমাদের উদ্দেশ্য পরম সুখ অর্জন করার জন্য কীভাবে এইগুলি ব্যবহার করা উচিত ! তিনটি অবস্থাগুলো হলোঃ

* জাগরিত

* স্বপ্ন

* সুষুপ্তি

প্রশ্ন

চারটি শরীর কি ?

আমরা যেটা দেখি সেটা হলো স্থুল শরীর।

সুক্ষ্ম শরীর হচ্ছে সেই দেহটি যেটা পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ প্রাণশক্তি, পাঁচ অনুভুতি শক্তি, প্রকৃতির পাঁচটি সূক্ষ্ম গঠন (সুক্ষ্ম ভুত), মন ও বুদ্ধি নিয়ে গঠিত।

এই সুক্ষ্ম শরীর এমনকি মৃত্যুর পরেও আত্মার সাথে থাকে এবং পরবর্তী জীবনে চলতে থাকে। পূর্ববর্তী জন্মে মৃত্যুর মাধ্যমে পরম সুখের দিকে যাত্রার পথটি বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তী জন্মে এই যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য আত্মা এটিকে (সুক্ষ্ম শরীরকে) ব্যবহার করে।

এই সূক্ষ্ম শরীর (Subtle Body) (মূল) প্রকৃতির অংশ দ্বারা এবং আত্মার একটি অর্ন্তনিহীত অংশ দ্বারা গঠিত। মুক্তি বা পরিত্রাণের সময়, প্রকৃতি দ্বারা তৈরি অংশ আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং শুধুমাত্র অর্ন্তনিহীত অংশগুলি রয়ে যায়। সুতরাং, আত্মা সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই কেবল তার কর্ম পরিচালনা করতে পারে। এইটি আত্মার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রক্রিয়া।

কারণ শরীর (Causal Body) গভীর ঘুমের জন্য দায়ী। এটি প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এবং সকল আত্মার জন্য একই।

তুরীয় শরীর (Superior Body) হল সেই শরীর যেটা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ তৈরী করে এবং তাঁর সীমাহীন সুখের আধারে আমাদের প্রবেশাধিকার এনে দেয়। এটি মুক্তির সময় আত্মার সাথে থাকে এবং ঈশ্বরের আনন্দ সর্বাধিক উপভোগ করতে সক্ষম করে।

এগুলো সবই জড় এবং আত্মা থেকে ভিন্ন।

তারা সক্রিয় হয় শুধুমাত্র যখন ঈশ্বরের সহিত আত্মা মিলিত হয়। বিবেকের মাধ্যমে, প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে এই নির্জীব সরঞ্জামগুলির বাইরে তার আত্মপরিচয়টি বুঝতে পারে। যে কোন ব্যাক্তির এটি জানা উচিত, এটির দোষ খোঁজার বা প্রশংসা করার জন্য নয়, বরং আত্মাকে জানার জন্য যেটা কেবলমাত্র তাদের চালক।

যে ব্যাক্তি এটি বুঝতে পারে, সে তার ভিতরের কন্ঠস্বরের মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্দেশিকা বুঝতে শুরু করে। যখনই আত্মা কোনও কর্ম করার জন্য উপরে বর্ণিত এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে, এই অর্ন্তনিহীত কন্ঠস্বরটি এটি পরিচালনা করে। যদি এটি একটি ভাল কর্ম হয়, সে ব্যাক্তি সুখ, নির্ভীকতা, উত্সাহ, ইত্যাদি অনুভব করে। যদি এটি একটি খারাপ কর্ম হয়, সে ব্যাক্তি ভয়, সন্দেহ, এবং লজ্জা বোধ করে। এইটি ইশ্বরের চলমান পরামর্শ। যে ব্যাক্তি এটিকে অনুসরণ করতে পারে সে ঐ মুহুর্ত থেকে মুক্তি পর্যন্ত পরম সুখ অর্জন করে। যে এটিকে অনুসরণ করে না সে ক্রমান্বয়ে বন্ধন ও দুঃখ অর্জন করে।

এটি পুনরাবৃত্তিমূলক হতে পারে। কিন্তু পরম সুখের পিছনে থাকা অন্যান্য প্রতিটি কৌশলের চাবিকাঠি হলো এটিই এবং তাই পুনরাবৃত্তির যোগ্য।

একইভাবে, আত্মা, প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং তিনটি মধ্যে সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রত্যেককে বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। প্রত্যেককে অন্তরঅবলোকন (introspect) করতে হবে, অধ্যয়ন, কর্মের মধ্যে অনুশীলন করতে হবে এবং এই বুদ্ধিমত্তাকে দৃঢ় করার জন্য গভীর চিন্তা করতে হবে। এটি মুক্তি কাঠামোর প্রথম উপাদান গঠন করে।

প্রশ্ন

বৈরাগ্য বা বিচ্ছিন্নতা কি ?

যা কিছু অস্থায়ী, অশুদ্ধ, নিষ্প্রান এবং দুঃখের কারণ তা অর্জনের ইচ্ছা বর্জন করা এবং উদ্যমী সংকল্পের সহিত বিবেক ও বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলোকে স্থায়ী, বিশুদ্ধ, প্রাণবন্ত এবং অনন্ত সুখের কারণ, এইগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করাকে বৈরাগ্য বলা হয় । বিবেক ও বৈরাগ্যের পরে, প্রত্যেকের ষটক সম্পত্তির (Six-Fold Formula) উপর ভিত্তি করে কাজ করার উপর নজর দেয়া উচিত ।

প্রশ্ন

ষটক সম্পত্তি (Six-Fold Formula) কি ?

এইটি হলো যে কারো জন্য সবচেয়ে বড় ধন । প্রকৃতপক্ষে যে ব্যাক্তি এই ছয়টি রত্নের অধিকারী, তিনিই সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, আর যে ব্যাক্তি এগুলি থেকে বঞ্চিত অথচ মামুলি পাথর যেগুলো মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে চলে যায়, তা নিয়ে গর্বিত সে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যবান। তাই এখনই এই ছয়টি রত্নকে আঁকড়ে ধর।

১) শম - শম মানে ক্রমাগত আমাদের আত্মা এবং মনকে অধর্ম (বাজে কাজ যা মুক্তির দিকে চালিত করে না) থেকে দূরে রাখা, ধর্মের দিকে (ধার্মিক কাজ) নিয়োজিত রাখা ।

২) দম - দম মানে এমন প্রবণতা তৈরী করা যাতে আমাদের বুদ্ধি এবং কর্ম অঙ্গগুলির মাধ্যমে কোনও ধরনের খারাপ কাজ (যে ধরনের কাজ মুক্তির দিকে চালিত করে না যেমনঃ লাম্পট্য, জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘৃণা, কামনা, ব্যভিচার, নির্মমতা, হতাশা, ইত্যাদি) পরিচালনা করতে অস্বীকার করে এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ, শান্তি, সমবেদনা ইত্যাদির মত ভালো কর্মে নিয়োজিত হয়।

৩) উপরতি - উপরতি মানে এমন লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকা যারা দুষ্ট, প্রতারক বা অনৈতিক ।

৪) তিতিক্ষা - তিতিক্ষা অর্থ অপমানে, প্রশংসায়, পার্থিব জগতের লাভ, ক্ষতি অগ্রাহ্য করে মুক্তির পথ অনুসরনে স্হিরপ্রতিজ্ঞ থাকা।

৫) শ্রদ্ধা - শ্রদ্ধা মানে আমাদের ভিতরের-কন্ঠস্বর, বৈদিক জ্ঞান এবং অন্যান্য সত্য গ্রন্থ ও লোকজনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা। এ সবকিছুই হবে বিবেকের দ্বারা মূল্যায়নের পরে।

শ্রদ্ধা অর্থ কাল্পনিক বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং যা কিছু সত্য বলে অনুধাবন করা যায় পূর্ণ আবেগে তার অনুসরণ। সন্দেহ বা অপ্রয়োজনীয় সংশয়বাদ ধ্বংসেরই প্রনালী। এমনকি চূড়ান্ত লক্ষ্য বুঝার বিষয়ে যদি অস্পষ্টতাও থাকে, তবুও সেখানে পৌঁছানোর জন্য কর্ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়, কারণ লক্ষ্যের স্পষ্টতা না থাকলেও এই কর্ম ও পদ্ধতিগুলো উপকারী এবং অর্জনযোগ্য সেরা সম্পদ। কারণ স্নাতকোত্তরের পর কোন ভাল ক্যারিয়ারের বিষয়টি স্পষ্ট নয় (এই অজুহাতে) কেউই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তরিকভাবে পড়াশোনার বিষয়ে সন্দেহ বোধ করে না।

৬) সমাধান - সমাধান মানে মন নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা।

প্রশ্ন

মুমুক্ষুত্ব কি ?

যে ব্যাক্তি তার বিবেক ও বুদ্ধিকে এমনকি সামান্য পরিমানেও ব্যবহার করেছেন অন্য সকল আকাঙ্ক্ষা তার জন্য বাজে ব্যাপার। কিন্তু মুক্তির জন্য বেপরোয়া আকাঙ্খা থাকা উচিত। এই ইচ্ছাটি জ্বালানী হিসেবে কাজ করে যা একজন মুক্তি-আকাঙ্খীর ধারন করা প্রত্যেকটি কর্ম বা চিন্তাকে চালিত করে।

এভাবেই, কোনো ব্যাক্তির মুক্তির জন্য সেই স্তরের আকাঙ্খা থাকতে হবে, যেভাবে উত্তপ্ত গ্রীষ্মে কয়েকদিনের ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত ব্যাক্তির খাদ্য বা জলের জন্য আকাঙ্খা থাকে।

ধরুন কেউ কিছু সময়ের জন্য তার মাথা জলে ডুবিয়ে রাখে। যেভাবে সে ব্যাক্তি বাতাসে নিঃশ্বাসের জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং জগতে অন্য কোনকিছুকে বাতাসের চেয়ে অধিকতর অর্জনযোগ্য হিসেবে পায় না, যদি কোন ব্যাক্তি মুক্তির জন্য এই স্তরের আবেগকে অন্তরে স্থাপন করতে পারে, তবে সে নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হবে! ঈশ্বরের সুখের জলাধার অবিলম্বে তাঁর জন্য খুলতে শুরু করে।

এই মুমুক্ষুত্ব একটি আত্মার চরিত্রে শক্তি নিয়ে আসে যেটা পার্থিব চিন্তায় থাকা মানুষকে বিস্মিত করতে পারে। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বা শ্বাসরোধ যা আত্মার জন্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, তার বিপরীতে মুমুক্ষুত্ব একটি সুখের মাত্রা নিয়ে আসে যেটা অন্যভাবে কেউ কল্পনা করতে পারে না। মুমুক্ষুত্ব নিজেই এই জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবস্থা। এবং তার গন্তব্য আরো বিস্ময়কর!

এটাই আমরা পূর্বে "সুযোগকে গ্রহন করার অভ্যাস" হিসাবে আলোচনা করেছিলাম।

প্রশ্ন

আপনি কি অনুগ্রহ করে মুক্তি কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন ?

একটি কর্পোরেট বিবৃতির আকারে মুক্তি কাঠামোটি পুনর্বিন্যস্ত করতে দিন। এটি কিছুটা এমন হবেঃ

ভবিষ্যৎ স্বপ্নঃ সমস্ত সুখের উৎস ঈশ্বরের অসীম সুখের সহিত সরাসরি সংযোগ।

উদ্দেশ্যঃ সকল দুঃখকষ্ট দূর করা এবং চূড়ান্ত সুখ অর্জন করা এবং এই মুহূর্ত থেকেই সুখ অর্জন করা শুরু করা।

যোগ্যতাঃ পূর্বে আলোচিত বিবেক, বৈরাগ্য, ষটক সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারটি উপাদানে যে ব্যাক্তির উপলব্ধি আছে।

কৌশলঃ বেদ ও বৈদিক গ্রন্থে সযত্নে ব্যাখ্যা করা মুক্তি কৌশল সম্পর্কে অধ্যয়ন করে, সেটা বুঝা এবং সে অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করা।

প্রশ্ন

আমি কিভাবে ঠিকঠাক বুঝতে পারব এই ধারনাটি (concept) এই আলোচ্য সুক্ষ্ম বিষয়টির জন্য দরকারী ?

এইটি যথাযথভাবে বুঝতে শ্রবন চতুষ্টয় বা চার কৌশলের মোক্ষম পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে। এই পদ্ধতিটি যে কোন অধ্যয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা যায় তবে সবচেয়ে সুক্ষ্ম 'মুক্তি' সম্পর্কিত বিষয়ের জন্যই এটি প্রাসঙ্গিক এর (মুক্তি বিষয়টির) সহজাত স্বজ্ঞানলব্ধ বৈশিষ্ট্যের জন্য।

শ্রবণ - শ্রবন মানে কোনোধরনের চিত্তবিক্ষেপ ছাড়া কোনো বিষয় মনোযোগ সহকারে পড়া বা শ্রবন করা। এতে পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন।

মনন - মনন মানে শ্রবণের মাধ্যমে যা কিছু আত্মভুত করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাদের স্পষ্ট করতে হবে। শ্রবন ও মনন হাতে হাত ধরে একত্রে চলে। কোনো ব্যাক্তির যতবেশি সম্ভব শুধুমাত্র শ্রবন করা বা পড়াশুনা করা উচিত, তারপর যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। অন্যথায়, মানুষের প্রবনতা হলো সে নানা জিনিস গ্রহন করে নেয়।

নিদিধ্যাসন - নিদিধ্যাসন মানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যা অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি উপর গভীর চিন্তা করা। এইটি করতে মন নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়। এটি একটি 'অনুভূতি' বা এই বিষয়টির আরও সূক্ষ্ম অনুধাবনকে বিকশিত করে।

সাক্ষাতকার - সাক্ষাতকার অর্থ পূর্বে আলোচিত চার কৌশল এবং একই সাথে অনুশীলনের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধি।

প্রশ্নঃ অনুগ্রহ করে আপনি কি মুক্তি লাভের জন্য দরকারী কিছু কৌশল প্রদান করতে পারেন ?

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা পূর্বের ধারনাগুলোকে বুঝতে এবং এটিকে অনুশীলন করতে পতঞ্জলী যোগ অধ্যয়ন করুন (যোগের নামে ভুলভাবে শেখানো ব্যায়াম এবং শ্বাস নেয়ার প্রক্রিয়াটি নয়) ।

তমোগুন যেমনঃ রাগ, কুচিন্তা, অলসতা, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি হতে দূরে থাকুন, রজঃগুন যেমন ঈর্ষা, লালসা, মিথ্যা অহংবোধ, ঘৃনা ইত্যাদি হতে দূরে থাকুন । এবং সত্বগুন যেমনঃ প্রশান্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ, শুদ্ধ, ভয়হীন, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ইত্যাদি থাকুন।

সুখী লোকেদের সাথে বন্ধুত্বের অনুভূতি রাখুন, যারা দুঃখকষ্টে আছে তাদের দয়া দেখান ও সাহায্য করুন, ধার্মিক ও উত্তম চরিত্রের ব্যক্তিদের উপর খুশির অনুভুতি রাখুন এবং দুষ্ট লোকদের উপর ঘৃণাও রাখবেন না বা স্নেহও রাখবেন না । স্রেফ তাদের অসদাচার নির্মূল করার জন্য কাজ করুন।

মন-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আশ্চর্যজনক এবং সাধারণ মানুষ এটার জন্য ১% ও কাজ করেনা। মুক্তির জন্য, প্রত্যেকের অন্তত প্রতিদিন ২ ঘন্টা ধ্যান করা উচিত, যাতে বিবেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সে ব্যাক্তি প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি ও মনের অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে ।

যদি ২ ঘন্টা খুব কঠিন মনে হয়, ভাববেন না। আপনার জন্য যেটা সুবিধাজনক তা দিয়েই শুরু করুন (অন্তত ১৫ মিনিট) এবং এটাকে সুসংগঠিতভাবে বৃদ্ধি করুন । অনুশীলন সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু ধ্যানকে অভ্যাসগতভাবে জোরদার করা যায় না। তাই পরিমানে নয় বরং গুনমানে ফোকাস করুন ।

মুক্তি চারপাশের জগতের সাথে মেলবন্ধনে ঘটে। বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা হল মূর্খতা । তাই উপরের কৌশল ব্যবহার করুন যখনই আপনি সক্রিয়ভাবে আমাদের সমাজ ও বিশ্বকে রূপান্তর করতে কাজ করেন ।

আপনার মুক্তি-দক্ষতা অনুশীলন করতে এই চ্যালেঞ্জগুলি নিন । অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, সমাজে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, দেশ ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন এবং সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধগুলি চালিয়ে যান।

নিজেকে সীমিত করবেন না এবং আমাদের জগতে মুখোমুখি হওয়া বড় এবং বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে নিজেকে প্রসারিত করুন। কিন্তু আপনার যুদ্ধক্ষেত্রগুলি বুদ্ধির সাথে চয়ন করুন। একজন বুদ্ধিমান মুক্তি অন্বেষক সকল কিছু করে না বরং সে তার কার্যক্ষেত্রটি বেছে নেয় যেটা তার প্রকৃতি, প্রবণতা এবং সামর্থ্যের সাথে, বর্তমান অবস্থার চাহিদার সাথে ভালোভাবে খাপ খায় এবং তারপর দক্ষতাকে বর্ধিত করার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রতিরোধ করতে কাজ করে এবং মন নিয়ন্ত্রণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তার আচরন ও প্রবনতাকে দক্ষ করে। সবশেষে তিনি প্রার্থনা করেন: "কৃন্বন্তো বিশ্বমার্যম!" আসুন সমগ্র মানব সভ্যতাকে আর্য করি ! এবং তিনি এই লক্ষ্যের দিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেন।

প্রশ্ন

আমাকে আলোকিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন আমি সত্যকে জেনেছি। কিন্তু কিভাবে আপনি অন্যদের বিশ্বাস করাতে পারেন যে এইটি শুধুমাত্র একটি সৃজনশীল তত্ত্ব নয় বরং এইটিই সত্য এবং ? কেন তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে ?

দৃঢ় বিশ্বাস শুধুমাত্র তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আসবে। আমি কোন উপায়ে এই পক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

আমি যা সুপারিশ করতে পারি সেটা হলো বর্তমান বিশ্বের সকল বিদ্যমান আদর্শের মূল্যায়ন করুন, তাদের পরীক্ষা করে দেখুন এবং ভাবুন কেন তাদের বিশ্বাস করা উচিত। এর মধ্যে নাস্তিকতাকেও অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং কেন ও কিভাবে তারা অর্থাৎ সেই মতবাদগুলো, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে সংরক্ষিত গ্রন্থ বেদ যা প্রস্তাব করছে তার চেয়ে ভাল, সেটা মূল্যায়ন করুন।

এছাড়াও, বিবেচনা করুন যে তাদের মধ্যে কোনটি যদি আরো আকর্ষণীয় মনে হয়, তাহলে অন্যটি আকর্ষণীয় নয় কেন ? এটা কি নিছকই একটি ব্যক্তিগত পছন্দ নাকি আরও যুক্তিপূর্ণ কোনো কিছু ?

আমরা যাকিছু আলোচনা করেছি তা বিশ্বজুড়ে পর্যবেক্ষণের চাইতেও অধিকতর অন্তর্নিহিত। আমরা জানি আমরা অস্তিত্বশীল, আমরা জানি যে আমাদের শরীর সহ সমগ্র পৃথিবী সবচেয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, আমরা জানি যে মহৎ কর্মগুলো আমাদের জন্য আনন্দ আনয়ন করে, আমরা ফলদায়ক কিছু কাজ করতে স্বাভাবিক তাড়না অনুভব করি, ইত্যাদি। যখন এবং যেহেতু আমরা খারাপ সংস্কার হতে পরিত্রাণ পাই এবং মনকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, এই সকল জ্ঞান আরো অধিকতর স্বজ্ঞাত হয়।

এই তত্ত্ব স্বজ্ঞাত বা অর্ন্তজ্ঞানমূলক এবং জীবনের সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুসারে। অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে এ ধরনের কোনো অলৌকিক কিছুর কথা এটা বলে না। কর্ম বিধি সর্বত্র কার্যকর হতে দেখা যায়। এটা পরীক্ষা করতে আপনাকে বেশিদূর যেতে হবে না। শুধু ৩০ দিনের জন্য ইতিবাচক, প্রফুল্ল এবং উৎসাহী হোন, নেতিবাচক হতে অস্বীকার করুন, ভুল কাজ করতে অস্বীকার করুন এবং আপনার জীবনে যাকিছুই ঘটেছে তা কেমন ছিলো বা আপনি কেমন অনুভব করেছেন, তা লিখে রাখুন। আপনি এই ক্ষুদ্র পরীক্ষায় আপনার আনন্দের মাত্রাকে উচ্চতর হতে দেখবেন। এই তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্বের চেয়েও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, বিবর্তন তত্বের ব্যাপারে কেউ কখনও সাক্ষ্য দেয়নি, অথবা অলৌকিক ঘটনাগুলির গল্প যা কেউ কখনো দেখেনি। আপনি একমত হবেন যে, "ঈশ্বর সর্বদা আছেন এবং সবসময় আমাদের রক্ষা করেন এবং আমাদের পালন করেন এবং আমাদের সুযোগ দেন এবং আমাদের কল্যাণের জন্য কাজ করেন সকল সময় ন্যূন্যতম বিচ্যুতি ছাড়াই আমাদের মুক্ত ইচ্ছাকে সন্মান দেন।" এটি ছাড়া আর অন্য কোন তত্ত্ব নেই যা আরও যুক্তিপূর্ণ, অর্ন্তজ্ঞানমুলক এবং একই সাথে প্রেরণা দানকারী।

এবং অবশেষে, যুক্তিহীনভাবে ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তাই স্রেফ সত্যকে গ্রহণ করুন এবং মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং এগিয়ে যান!

প্রশ্ন

একবারে বুঝটা খুব বেশী কঠিন। আপনি কি সংক্ষেপে বলতে পারেন?

ঈশ্বর, আত্মা, মূল প্রকৃতি তিনটি শ্বাশত উপাদান যা সর্বদা বিদ্যমান আছে এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। এটিই 'ট্রিনিটি' এর প্রকৃত ধারণা। এই তিনটি সত্ত্বা একে অপরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে থাকে, এবং কখনও ধ্বংস হয় না বা সৃষ্টি হয় না।

প্রকৃতি শাশ্বত। আত্মা শাশ্বত এবং সচেতন। ঈশ্বর শাশ্বত, সচেতন এবং সুখের উৎস।

ঈশ্বর সকল শক্তির উৎস। ঈশ্বরের কোনো বৈশিষ্ট্য কখনও পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর আকাশে বসেন না। তিনি সর্বব্যাপী। তিনি আমাদের সাথে এবং আমাদের মধ্যে আছেন সর্বদা!

ঈশ্বর আমাদের শূণ্য থেকে কখনই সৃষ্টি করেন নি। যখন আমরা বলি যে ঈশ্বর একজন স্রষ্টা, আমরা বুঝাই তিনি আত্মা ও প্রকৃতিকে একত্রিত করেন এই বিশৃঙ্খলতাহীন সুপরিকল্পিত আকৃতি প্রদান করতে। তারপর তিনি আত্মাকে সাহায্য করার জন্য মহাবিশ্বকে রক্ষনাবেক্ষন করেন। অবশেষে, তিনি মহাবিশ্বকে ধ্বংস করেন এবং আবার সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই সমস্ত সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংসের ঘটনা চলমান থাকে

ঠিক যেমন রাত এবং দিন একে অপরের অনুসরণ করে। এমন কোনও সময় ছিল না যখন এই প্রক্রিয়াটি ছিল না এবং এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, এমনটা কখনই হবে না। এ কারণেই তাঁকে ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (নিয়ন্ত্রক) এবং প্রলয়কর্তা (ধ্বংসকারী) বলা হয়।

ঈশ্বর আত্মা বা প্রকৃতি সৃষ্টি বা ধ্বংস করেন না। তিনি শুধুমাত্র একজন সুপার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন, তিনি আত্মা ও প্রকৃতিকে একত্রিত করেন যাতে আত্মা পরম সুখ অর্জন করার জন্য কর্ম বিধি অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

আমরা, আত্মারূপে, অনন্তকাল চেতন। আমরা মন, বুদ্ধি, অনুভুতি, কর্ম অঙ্গ এবং আমাদের চারপাশে যা আছে সব কিছু থেকে আলাদা। কিন্তু আমাদের একটি সরাসরি ও শাশ্বত সম্পর্ক রয়েছে, সকল আনন্দের উৎস ঈশ্বরের সাথে। সুখময় ঈশ্বর এবং আমাদের (সম্পর্কের) মাঝে কোন বার্তাবাহক, নবী বা অবতার নেই।

আত্মার মুক্ত ইচ্ছা আছে। কিন্তু এটি তাদের জ্ঞান সাপেক্ষে, যেটা তাদের কর্মের উপর নির্ভর করে। এইটিই কর্ম বিধির ভিত্তি গঠন করে।

কর্ম তত্বের মাধ্যমে সুখ বাড়ানোই হলো আত্মার উদ্দেশ্য।

আমাদের ভাগ্য ঈশ্বর দ্বারা কোন বইয়ে লিখিত না। আমাদের জীবনে যা ঘটছে তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার ফল। এবং আমরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি।

মৃত্যু কখনই একটি চূড়ান্ত শেষ হয় না। এটা শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি, এর পরে যাত্রা নির্বিঘ্নে অব্যাহত থাকে। কোন শাশ্বত স্বর্গ বা নরক নেই।

মানুষের আত্মার জন্য ব্যবহারকারী পুস্তিকা হল বেদ। (আনন্দ অর্জনের পথে চলা) শুরু করতে গেলে বেদে বিশ্বাস থাকা দরকার হয় না, কিন্তু আপনি যদি সত্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে থাকেন তবে শেষ পর্যন্ত আপনি বেদে আসবেন।

ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সঙ্গে, এবং তিনি সর্বদা আমাদের সাহায্য করছেন। আমাদের কেবল ইচ্ছাশক্তির অনুসরণ এবং সত্য গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রতি মুহূর্তে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমরা সত্য অন্বেষনের মাধ্যমে আমাদের ভাগ্য এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারব। এইটি বেদ মূল বার্তা এবং জীবনের মূল কথা। সত্য অনুসন্ধানের এই কর্ম আত্মার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আমরা যখন তা করি, আমরা দ্রুত পরম সুখের দিকে অগ্রসর হই।

যখন আমরা আমাদের এই সত্য পরিচয় বুঝতে শুরু করি, সত্য গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু করি, এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরু, করি, আমরা অবিলম্বে অধিকতর আত্মবিশ্বাস, সুখ, আনন্দ, সন্তুষ্টি, উৎসাহ, এবং অর্জন পেতে শুরু করি। আমরা জগৎকে বিস্মিত করে তুলতে পারি। এবং তারপর আমরা, জগত এবং সমাজ মুখোমুখি হচ্ছে এমন চ্যালেঞ্জগুলি ব্যবহার করে উজ্জ্বলতা অধিকতর বাড়িয়ে তুলতে পারি। এবং এই প্রক্রিয়ায় আরো মজা পেতে পারি!

যে মুহূর্ত থেকে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি সেই মুহূর্ত হতে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। এটা আমাদের পছন্দ। আমাদের কারো অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। এই পৃথিবীতে এর তুলনায় আর অধিকতর মূল্যবান কিছু আর নেই যেটা এই মুহুর্তে ও পরবর্তীতে অতুলনীয় আনন্দের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এই রাম এবং কৃষ্ণের মধ্যে কিংবদন্তি তৈরি করেছে। আমরা আমাদের মধ্যে থাকা ঐ কিংবদন্তিদের বের করে আনতে পারি এই মুহুর্তে এবং এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সুখকে পুনরুদ্ধার করতে পারি।

শেষ হওয়ার আগে, আসুন আমরা সকল আত্মার জন্য বেদ হতে কিছু আশ্চর্যজনক ও অনুপ্রেরণাদায়ী প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারন করি।

"যারা অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং নিরলসভাবে চেষ্টা করে না, তারা সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জন করতে পারে না। একজন অলস ব্যক্তি, যিনি কেবল ভাবেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু করেন না, এই মহা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ঈশ্বর শুধুমাত্র তাকেই সাহায্য করেন যিনি সেরা প্রচেষ্টা করেন। অতএব, চলতে থাক, চলতে থাক।

একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি তার শরীরকে শক্তিশালী করে, এবং তার আত্মা কর্ম ফল প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়। প্রচেষ্টা সকল বাঁধাকে ধ্বংস করে। অতএব, চলতে থাক, চলতে থাক।

ভাগ্য কি ? যিনি বসে আছেন, তিনিও তার বসে থাকা ভাগ্যকে তৈরী করেন। ঘুমিয়ে থাকা ব্যাক্তিও তার ঘুমন্ত ভাগ্যকে তৈরী করেন। যে ব্যাক্তি হাঁটেন তিনি তার ভাগ্যকেও নিয়ে যান সম্মুখের দিকে। অতএব, চলতে থাক, চলতে থাক।

যখন কোনো ব্যাক্তি ঘুমায়, এটা হয় কালিযুগ। যখন কোনো ব্যাক্তি জেগে উঠেন, এটা হয় দ্বাপরযুগ। যখন কোনো ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন হয় ত্রেতা, এবং যখন তিনি কর্মে নিয়োজিত হন, তিনি সত্যযুগ তৈরি করেন। অতএব, চলতে থাক, চলতে থাক।

কেবলমাত্র যে ব্যাক্তি হাঁটেন তিনিই মধুর স্বাদ এবং আনন্দ লাভ করেন। কেবলমাত্র যিনি চলেন কর্মের সুমিষ্ট ফল অর্জন করেন। সূর্যের দিকে তাকাও, এটি কখনই থামে না বরং

চলতে থাকে। অতএব, চলতে থাক, চলতে থাক।

আমার দেশ ও সমগ্র মানবজাতি সঠিক পথে যেন চলতে শুরু করে, উজ্জ্বল সূর্যের মতো জ্বজ্জল্যমান যেন হয় এবং সত্যযুগকে অবিলম্বে নিয়ে আসে। হে ইশ্বর ! আমাদেরকে যথাসম্ভব কর্মে নিয়োজিত করুন এই আকাঙ্খাকে যথাশীঘ্র পূর্ণ করার জন্য।

ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন, আমরা যেন আমাদের অনুসরনীয় ব্যাক্তিত্ব রাম ও কৃষ্ণের মত ধর্মকে গ্রহন করতে পারি। এবং বিশেষ করে আমাদের নিজেদের ভাই ও বোনদের উৎসাহিত করি, যারা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে পূর্ণ বিদেশী ধর্মবিশ্বাস অনুসরন করে, তারা যেন তাদের মূল, বেদের গৃহে ফিরে আসে।

আমরা সবাই যেন একত্রিত হই এবং সম্পূর্ণ বিশ্বজগতের উন্নতির জন্য আমাদের জাতিকে সারা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে নিয়ে যেতে পারি।

এটির জন্য একমাত্র পথ হলো সত্য ঈশ্বরকে সত্যিকারের উপাসনা করা এবং খুব শীঘ্রই যেন এটি হয় !

আমরা, পৃথিবীর সকল বাসিন্দারা যেন আমাদের হৃদয়ের ঐক্যমতের সঙ্গে এবং আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্যতায় অবিরতভাবে কল্যানময় ঈশ্বরের উপাসনা করি।

হে ঈশ্বর ! আপনি আমাদেরকে জ্ঞান এবং আনন্দ প্রদান করুন। আপনি সৃষ্টি করেন এবং পরিচালনা করেন সমগ্র বিশ্বকে ! আমরা আপনার কাছে অনুরোধ করি আমাদেরকে আপনি দুঃখ থেকে দূরে রাখুন এবং একই সাথে সব রকম দুঃখের কারণ মন্দ অভিলাষগুলি থেকে দূরে রাখুন। এবং আমাদেরকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং সকলের জন্য উপকারী যা কিছুই আছে সেথায় আমাদের পরিচালনা করুন। আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র বিশুদ্ধতা থাকুক এবং সমস্ত মন্দ চিন্তাধারা দূর হয়ে যাক এবং আপনার পথ প্রদর্শনে ও আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেন পার্থিব আনন্দ, যেমন শক্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ জাতি, সুস্থ দেহ একই সাথে পরিত্রাণের আধ্যাত্মিক সুখ ইত্যাদি অর্জন করি !

এ সবকিছুর জন্য হে ঈশ্বর আপনাকে ধন্যবাদ ! দয়া করে আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করুন যাতে আমরা যেন আমাদের নিজেদের দেশ এবং পৃথিবীকে আপনার ন্যায় রাজ্যের মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে, আমাদের যথাযথ প্রচেষ্টা চালাতে পারি। আমরা যেন দুর্নীতি, অনৈতিকতা এবং বর্বরতার সমস্ত শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারি। আমাদের দেশে যেন কোনও শক্তিহীন, প্রতারণাপূর্ণ, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অকৃতজ্ঞ, রাষ্ট্রদ্রোহী না হয়। এবং আমরা যেন চরিত্রের, সমবেদনার, ন্যায়বিচারের, অধ্যবসায়, আন্তরিকতা, প্রতিশ্রুতি, আস্থা,

ঐক্য এবং উদ্দেশ্যপূর্ণতার গুনগুলোকে অঙ্কন করে আদর্শের সেরা উদাহরণ স্থাপন করতে পারি !

আমরা যেন সবাই অন্বেষন করি মুক্তির পথে চলা এমন একটি শক্তিশালী, জোরালো, নিস্বার্থ মিশনকে, যেটি শুধুমাত্র আমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না অধিকন্তু দেয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছি যেটা কেবল আমার দ্বারাই নয় বরং সমাজ, জাতি ও সমগ্র মানবতার জন্য সীমিত ! ঈশ্বর যেন আমাদেরকে শক্তি, উত্সাহ, এবং বিশুদ্ধতা এখনই মঞ্জুর করেন !

ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি !